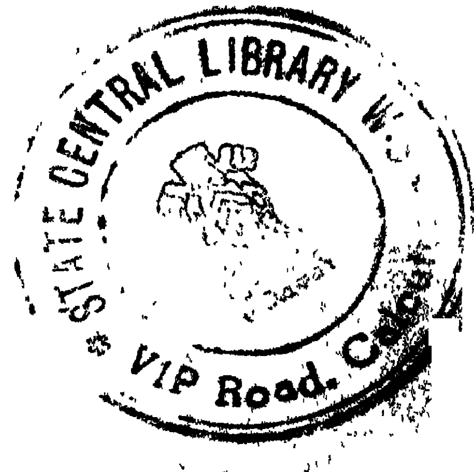
ট্রামের সেই লোকটি



শ্রীপরিমল গোস্বামী



জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৪
দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই, ১৯৪৬
মূল্য দুই টাকা

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের
মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট,
কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্তী

সুহৃদ্বরেষু—

সূচীপত্র

'দৈবঘটনা' গল্পের চারিখানি ছবি শ্রীশৈল চক্রবর্তী অঙ্কিত। অবশিষ্ট একুশখানি ছবি ও প্রচ্ছদপট শ্রীকালীকিঙ্কর ঘোষ দস্তিদার অঙ্কিত।

ট্রামের সেই লোকটি

নতুন চাকরি পেয়ে অনেক দিন পরে কলকাতা এলাম, কিন্তু এসে প্রথমেই লোক-বাহুল্যের আতঙ্কে মনটা দমে গেল।

এই ভিড়ে অফিসে যাব কি ক'রে?



....প্রত্যেকে আমারই মতো ঝুলছে।

এ প্রশ্নের মীমাংসা ক'দিন পরেই অবশ্য হ'য়ে গেল—চাকরিটি আর নেই। কতকটা দায়ে পড়ে, কতকটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাবশত, এবং কতকটা মানবতা বোধের জন্যেই চাকরিটি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এতে আমার নিজের দোষ

কতখানি আর ট্রামের সেই লোকটির দোষ কতখানি তা আমি আজও বুঝতে পারিনি।

বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট থেকে বেলা সাড়ে নয়টার সময় ট্রামে উঠতে গিয়ে দেখি ওঠা সহজ নয়! এদিকে সময় হাতে বেশি নেই, দশটায় অফিসে পৌঁছতে হবে, তাই জোর ক'রে ট্রামের হ্যাণ্ডেলটি ধ'রে ফুটবোর্ডের উপর দাঁড়িয়ে গেলাম। আমার গায়ে গায়ে লাগানো আরও প্রায় দশজন যাত্রী, প্রত্যেকে আমারই মতো ঝুলছে।

ট্রামের ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখি ভিতরে দাঁড়াবার জায়গা সবই খালি, সেখানে অন্তত দশজন লোক গিয়ে দাঁড়াতে পারে, সীটও দু'একটা খালি মনে হ'ল। কিন্তু দেখলাম কেউ সেদিকে যাচ্ছে না, দরজার কাছে সবাই পরস্পরকে চেপ্টা ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

এই রকম বিপজ্জনক-ভাবে-ঝুলে-থাকা-যাত্রীদের ঠেলে আমি উপরে ওঠার চেষ্টা করলাম, কিন্তু প্রায় ত্রিশজন যাত্রীর চাপ ঠেলে উপরে ওঠা গেল না।

চেঁচিয়ে বললাম, আপনারা একটু ভিতরে এগিয়ে যান না।

কিন্তু আমার কথায় কোনো কাজই হ'ল না, কথাটা যেন কারও কানেই গেল না। দু'একজন যাত্রী আমার দিকে চেয়ে চেয়ে হাসতে লাগল, যেন কতবড় অসম্ভব কথা বলেছি।

ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, একটি লোক ট্রামের প্রবেশ মুখের কাছে যে হ্যাণ্ডেলটি আছে, সেইটি ধ'রে নির্বিকার-

ভাবে ভিতরে যাওয়ার পথটি বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু কেউ তাকে কিছু বলছে না।

যে লোকটা স্পষ্টতই "পাব্লিক এনেমি নাম্বার ওয়ান"—তার সম্বন্ধে সবার এই উদাসীনতায় মনে বড় আঘাত লাগল।

পিঠেও প্রায় আঘাত লাগছিল, কোনো রকমে সবাই মিলে সম্মুখের দিকে ঝুঁকে বেঁচে গেলাম। প্রকাণ্ড একখানা ছাইরঙের লরি পিঠকে প্রায় স্পর্শ ক'রে তীব্র বেগে ছুটে গেল।

ট্রাম এক একটা জায়গায় এসে থামছে, ভিতর থেকে দু'একজন নামার চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। যারা অফিসে যাবে ব'লে এসেছে তারা কিন্তু কেউ ফিরছে না। এই ভাবে প্রত্যেক স্টপেই নবাগতদের চাপ ক্রমে বাড়তে লাগল, কি ক'রে যে তারা এত চাপের ভিতরেও একটুখানি জায়গা ক'রে নিচ্ছে তা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। এই ভাবে যেখানে আর একজনেরও ওঠা অসম্ভব ছিল সেখানে আরও প্রায় ত্রিশজন উঠল।

কৌশলটা বিশেষ কঠিন নয়। হ্যারিসন রোড পর্যন্ত যখন ঝুলে-থাকা-লোকগুলোর প্রসার ট্রাম থেকে পাঁচ হাত পরিমাণ বাইরের দিকে ঠেলে এসেছে তখন দেখা গেল বাকি লোকেরা সেই সব লোকের কোমর ধ'রে ঝুলছে। তারপর দেখি কলুটোলার মোড়ের যাত্রীরা জামা, কাপড়, হাত, পা, যে যেখানে যা সুবিধে পেল তাই ধ'রে ঝুলতে লাগল। আমার

কোমর ধ'রে একটি ভারী গোছের লোক ঝুলে রইল, আমার দু পা ধ'রে দু'জন—এবং একখানা হাত খালি পেয়ে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক তা ধ'রে ফেললেন।

সবারই এক অবস্থা, কারোই কিছু বলবার নেই।

মেয়েদের আসনে একটি মেয়ে বসেছিল, বোধ হয় সে



....অবশেষে বেণী ধ'রে ঝুলে পড়লেন।

ইউনিভার্সিটির ক্লাসে আসবে বলে রওনা হয়েছিল, কিন্তু নামা অসম্ভব বুঝে সেইখানেই ব'সে আছে। হাতে তার এক গাদা বই, বোধ হয় ডালহৌসি স্কয়ার ঘুরে আসা তার পক্ষে বেশি সুবিধাজনক, তাই সে ইউনিভার্সিটির দিকে এবং পিছনের ভিড়ের দিকে একবার চেয়েই মৃদু হেসে বই খুলে পড়তে আরম্ভ করল। এমন সময় ট্রাম বৌজারের মোড়ে এসে থামল।

এক শীর্ণ বৃদ্ধ ভদ্রলোক উন্মাদের মতো ছুটোছুটি ক'রেও

কারো কোমর বা হাত ধরতে না পেরে অবশেষে মেয়েটির বেণী ধ'রে ঝুলে পড়লেন।

সমান দুরবস্থায় সবাই সবার প্রতি দরদী হ'য়ে ওঠে, কেউ কাউকে কিছু বলে না। মেয়েটিও কিছু বলল না, বরঞ্চ দেখলাম বৃদ্ধের সুবিধার জন্যে মাথাটা তার দিকে আরও খানিকটা এগিয়ে দিল।

কিন্তু যে লোকটির জন্যে এত যাত্রীর অসুবিধা সে কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপও করছে না। তার কথা ভেবে আমার রক্ত গরম হ'য়ে উঠল, ভাবলাম চাকরি চুলোয় যাক এই লোকটিকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। ডালহৌসি স্কয়ারে যেখানে আমার নামার কথা সেখানে নামা হ'ল না।

আমার হাত পা কোমর গলা ধ'রে যারা ঝুলে ছিল তারা সব লালবাজার থেকেই নামতে শুরু করল, ট্রামের ভিতর থেকেও তখন অনেকের নামা সম্ভব হ'ল সেই লোকটিকে ঠেলে। আমি সুযোগ বুঝে উপরে উঠেই লোকটির জামার গলা ধ'রে প্রশ্ন করলাম, এর মানে কি? উত্তেজনায় তখন আমার হাত পা কাঁপছে।

লোকটি আমার কথার কোনো উত্তরই দিল না। তখন আমি নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না—তার পাঁজরে এক ঘুসি দিয়ে বললাম এতগুলো লোকের অসুবিধা ক'রে তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ, তোমার কোনো আক্কেল নেই?—তোমাকে কিছু শিক্ষা দেওয়া দরকার।

শিক্ষা দিলাম মনের মতো ক'রেই। কিন্তু লোকটি আমাকে কিছুই বলল না।

ঘুসি মারার সময় চকিতে যেন মনে হ'ল ভিতরের যাত্রীরা আমার দিকে বিরক্তভাবে চাইছে, মেয়েটির চোখও আমার উপর যেন অভিশাপ বর্ষণ করল।

নিজেকে সংযত করলাম। এ কি রহস্য? এত মার খেয়েও লোকটা নির্বিকার কেন, জনসাধারণের শত্রুর প্রতি ট্রাম যাত্রীদের এত সহানুভূতিই বা কেন, কিছুই বুঝতে পারলাম না। হঠাৎ বিভ্রান্তভাবে নেমে পড়লাম।

এর পর প্রায় একমাস কেটে গেছে। এখন আমি বুঝতে পেরেছি ট্রামের সেই লোকটি কে, এবং কেন সে এত করুণার পাত্র।

সে একটি হ'য়েও একটি লোক নয়।

নতুন পুরনো সকল বিভাগের প্রত্যেক ট্রামের প্রত্যেক ফার্স্ট ও সেকেণ্ড ক্লাসে সেই লোকটির দেখা পাওয়া যাবে। সকালের প্রথম গাড়ি থেকে রাত্রের শেষ গাড়িটিতে তাকে দেখা যাবে। একই লোকের একই সময়ে এতগুলো বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান কি ক'রে সম্ভব হ'ল তা কোনো যুক্তিশাস্ত্র বলতে পারে না। ট্রামের সেই লোকটি প্রকৃতির সকল নিয়মকে অগ্রাহ্য ক'রে ট্রামের প্রবেশ পথে হ্যাণ্ডেলটি ধ'রে নির্বিকার

চিত্তে দাঁড়িয়ে আছে। যদি কেউ তাকে না দেখে থাকেন তবে এই মুহূর্তে যে কোনো ট্রামের দিকে চেয়ে দেখুন।

ঐ তো সে দাঁড়িয়ে আছে বিষণ্ণ মুখে উদাস দৃষ্টিতে। তার মেরুদণ্ডে দিনের পর দিন কত নরনারীর আঘাতের ইতিহাস লেখা হচ্ছে। তার পায়ের উপর, পিঠের উপর প্রচণ্ডতম চাপের চিহ্ন আঁকা হচ্ছে—সেখানে ভূগর্ভস্থ স্তরের মতো আঘাতের স্তর একের পর এক জমা হচ্ছে। অফিসের সময় যাত্রীদের পথরোধ ক'রে সে দাঁড়িয়ে থাকে, কাউকে উঠতে দেয় না, অথচ সবাই তাকে করুণা করে।

প্রথম দিন আমার সন্দেহ হয়েছিল, হয় তো সে পকেট-মার। কিন্তু আমার সন্দেহ অমূলক, কেননা তা হ'লে কেউ তাকে প্রশ্রয় দিত না। আমিও পরে মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে দেখেছি সে তার পাশের লোকের পকেট বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি নিজের বুক পকেট এক দিন তার প্রায় নাকের কাছে রেখে দেখেছি, সে ভুলেও সেদিকে তাকায়নি।

কিন্তু সে কে তা জানতেই হবে এই সঙ্কল্প নিয়ে তার পিছনে লাগলাম। নিজের সমস্ত আশাভরসা ভবিষ্যৎ জলাঞ্জলি দিয়ে তাকে অনুসরণ করতে লাগলাম। মাসখানেক পরিশ্রম করার পর আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। তার মোটামুটি একটা পরিচয় আমি খাড়া করতে পেরেছি।

সে কোনো অফিসে সামান্য বেতনে চাকরি করে। পরিবারে অনেকগুলো লোক, কিন্তু কাউকে সে পেট ভরে

খেতে দিতে পারে না। স্ত্রী সর্বদা তার উপর খড়্গহস্ত। দিনরাত অভাবের কথা শুনে শুনে তার মন সংসারের প্রতি বিরূপ। তার অতীত নেই, বর্ত্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই। তার কাছে জীবন আর মৃত্যু এক, তার কাছে ব'সে থাকা আর দাঁড়িয়ে থাকায় কোনো পার্থক্য নেই। ট্রামে সে বাধ্য হ'য়ে ওঠে অফিসে অথবা অন্য কোথায়ও যাবার জন্যে, কিন্তু কোথায়ও তার কোনো সম্মান নেই। বাড়ি তার কাছে বন্দীশালা, অফিস তার কাছে বিষাক্ত, বাইরেব পৃথিবী তার কাছে আলোহীন। তাই সে ট্রামে এক পা উঠে সেইখানেই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, দ্বিতীয় পদক্ষেপে আর তার মন থাকে না। তারপর তার পিঠের উপর চলতে থাকে যাত্রীদের গুঁতো, কিন্তু সে বুঝতে পারে না কিছুই।

প্রাণহীন, উৎসাহহীন, মধ্যবিত্ত বাঙালীর প্রতীক সে। জগতের সকল দুঃখ বেদনা তার বুকে জমা হয়েছে, কিন্তু প্রতিকারের শক্তি নেই। সে তৃণখণ্ড, নিরুদ্দেশ ভেসে চলেছে। তার জামার নিচে সর্বদেহে অন্তত বারোটা মাদুলি বাঁধা আছে। জগতের সবার লাথি খেয়ে আসছে সে বংশ বংশ ধ'রে! এই ভাগ্য সে নীরবে মেনে নিয়েছে।

এইসব তথ্য সংগ্রহ করতেই আমি চাকরিটি খুইয়েছি বটে কিন্তু ট্রামের সেই লোকটিকে যে চিনতে পেরেছি সেটাই আমি আপাতত বেশি লাভ মনে করছি।

(জনসেবা, ১৯৪৩ ; পুনর্লিখিত)

বৈবাহিক বৈচিত্র্য

বাগবাজারের কোনও এক রাস্তায় এক বাড়ির বৈঠকখানায় বসিয়া ১৩৬৩ সালের ১লা চৈত্র বেলা দশটার সময় শশধর চক্রবর্তী সিউড়ি হইতে আগত নিম্নলিখিত পত্রখানি পাঠ করিলেন।

সবিনয় নমস্কারপূর্বক নিবেদন,

মহাশয়ের পত্র পাইয়া পরম প্রীত হইলাম। আপনার পুত্র শ্রীমান্ জলধর আমার কন্যার মাতুলের সহযোগিতায় কলিকাতাতেই আমার কন্যাকে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছে ইহা অপেক্ষা আনন্দের কথা আর নাই। পত্রযোগে আপনাদের বিষয় আমি সমস্তই অবগত আছি। আপনাদের ব্যবসায়ের কথা এবং ব্যবসায়ে সততার কথা সর্বজনবিদিত। আমাদের এই মফঃসল শহরেও আপনাদের খ্যাতির সংবাদ পৌঁছিয়াছে। সুতরাং আপনারা যে আমার কন্যাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন ইহাতে আমি আপনাদের প্রতি যে কি পরিমাণ কৃতজ্ঞ হইয়াছি তাহা লিখিয়া প্রকাশ করিতে অক্ষম। শ্রীমান্ জলধর এম্-এ পাস করিয়া ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়াছে ইহা তাহার উপযুক্তই হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত শিক্ষা বা উন্নতি ছাড়াও আমি পারিবারিক এবং বংশগত আচার-ব্যবহার এবং সংস্কৃতির উপরেই অধিক আস্থাবান। সুখের বিষয় সেদিক দিয়াও আমি নিশ্চিন্ততা অনুভব করিতেছি। সুতরাং এইক্ষণে আমার কর্তব্য, মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং আলাপাদি করিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা। আমি

স্থির করিয়াছি আগামী ৫ই চৈত্র রবিবার সকালে কলিকাতা পৌঁছিব এবং সোজা গিয়া আপনাদের আতিথ্য গ্রহণ করিব। ইতি

ভবদীয়

শ্রীসাধুচরণ মুখোপাধ্যায়

শশধর চক্রবর্তী পত্রখানা দুই বার পাঠ করিলেন এবং অন্তত চারি বার গোঁফে তা দিলেন। তারপর আর একবার চিঠিখানি সম্মুখে ধরিয়া, যেখানে লেখা ছিল "কিন্তু ব্যক্তিগত শিক্ষা বা উন্নতি ছাড়াও আমি পারিবারিক এবং বংশগত আচার-ব্যবহার এবং সংস্কৃতির উপরেই অধিক আস্থাবান"—সেই স্থানটির উপর কিছুকাল নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর চিঠিখানি ভাঁজ করিয়া ফাইল-জাত করিলেন।

৫ই চৈত্র বেলা অনুমান দশটার সময় সিউড়ি হইতে কলিকাতা পৌঁছিয়া সাধুচরণ মুখোপাধ্যায় নির্দিষ্ট গলিতে কোচম্যানের সাহায্যে বাড়ির নম্বর মিলাইতে মিলাইতে চক্রবর্তী-গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয় প্রাচীন ডাক্তার। কিন্তু সকলের কাছে তিনি কামানের গোলা বলিয়া পরিচিত। কিন্তু তাহা তাঁহার কেশবিরল গোলাকৃতি মস্তকের জন্যই নহে। শহর হইতে একটু দূরে ছোট্ট পাহাড়ের মত উঁচু জায়গায় তাঁহার বাড়ি। তাহারই এক দিকে একটি গাছ জন্মাবধি ভূমির সমান্তরাল ভাবে হেলিয়া গিয়া সেই ভাবেই বর্ধিত হইয়াছিল, শাখাপ্রশাখা অবশ্য আকাশমুখী ছিল। কিন্তু অনেক দিন

হইল গাছটির উপরার্ধ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে, এখন শুধু কাণ্ডটি কামানের মতো তাঁহার বাড়ির এক পাশ হইতে শহরের দিকে মুখ বাড়াইয়া আছে। এই কারণে তাঁহার বাড়ির নাম হইয়াছে কামানওয়ালা বাড়ি এবং তাঁহার নাম হইয়াছে কামানের গোলা। তাঁহার কণ্ঠস্বরের সঙ্গে কামানের আওয়াজের কিছু সাদৃশ্য আছে। কথা বলিবার সময় তিনি মাঝে মাঝে এমন অতর্কিতে গর্জন করিয়া ওঠেন যাহাতে সাধারণ রোগীর সর্বাঙ্গ এবং ম্যালেরিয়াগ্রস্তের প্লীহা চমকিত হয়।

বহু আশায় বুক বাঁধিয়া এই কামানের গোলা সেদিন চক্রবর্তী-গৃহে আসিয়া ফাটিয়া পড়িলেন। এরূপ চঞ্চল প্রকৃতি অল্পবয়স হইলে মানাইত, কিন্তু মুখুজ্জে-মহাশয় আটচল্লিশ বৎসর বয়সেও যেন শিশুটিই রহিয়া গিয়াছেন। এই শিশুর সারল্য হাত পায়ের চাঞ্চল্যে নয়, খাওয়া-দাওয়া বিষয়েও তিনি শিশুর মতই লোভী। কিন্তু বিশেষ দুরবস্থার মধ্যে বর্ধিত হইলে শিশুও যেমন সংসারবিষয়ে অনেকখানি অভিজ্ঞ হইয়া ওঠে, তেমনি এই প্রৌঢ় শিশুটি কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া চক্রবর্তী-গৃহে এমন সব বিষয়ীজনোচিত ব্যবহার করিলেন যাহা তাঁহার পক্ষে সহজও নহে, স্বাভাবিকও নহে, কারণ তাহা প্রায় পরিপক্ক লোকের ব্যবহার।

চক্রবর্তী-গৃহে পৌঁছিয়া তাঁহার প্রথমে জলধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। মুখুজ্জে-মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য

চক্রবর্তী-মহাশয়ই এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মুখুজ্জে-মহাশয়কে প্রণাম করিয়া জলধর নিজের পরিচয় দিল। মুখুজ্জে-মহাশয় তাহার সৌম্য আকৃতি এবং সপ্রতিভ ব্যবহারে আনন্দে গদগদ হইয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং অন্য কোনো আলাপ না করিয়াই বৈঠকখানা-ঘরের চারিদিক ঘুরিয়া, ভিতরের দিকের দরজায় উঁকি মারিয়া, গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন. "চমৎকার বাড়ি তো!"

সে গর্জনে জলধরের আপাদমস্তক কাঁপিয়া গেল। সে এজন্য প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আত্মস্থ হইয়া স্মিতহাস্যে বলিল, "আলো-হাওয়াটা একটু পাওয়া যায়।"

মুখুজ্জে-মহাশয় যেন ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন "একটু কেমন? বলি, হোয়াট ডু ইউ মীন্?—এ যে একেবারে ঝড়ের মতো হাওয়া!"

একটু আবেগেই মুখুজ্জে-মহাশয়ের ভাষা ইংরেজী-মিশ্রিত হইয়া পড়ে। তাই তিনি বলিতে লাগিলেন, "আর এ না হ'লে কি আমাদের মনে ধরে?—আমরা খোলা জায়গায় থাকি—ফর নাথিং খানিকটা আলো আর হাওয়া আমাদের চাই-ই, তবে আলোটা শীতকালে এবং হাওয়াটা গ্রীষ্মকালে।" বলিয়া তিনি এইবার গা হইতে চাদর এবং পাঞ্জাবী খুলিয়া ফেলিলেন। তারপর বলিলেন, "কিন্তু তোমার বাবার কথা তো এতক্ষণ জিজ্ঞাসাই করিনি, তিনি বাড়িতে আছেন তো?"

ভৃত্য উপস্থিত ছিল। সে চাদর ও পাঞ্জাবী যথাস্থানে

রাখিয়া দিয়া বলিল, "বাবু পূজো করছেন, পূজো শেষ হ'লেই চলে আসবেন, তিনি সব শুনেছেন।"

জলধর কিঞ্চিৎ বিস্ময়ে ভৃত্যের দিকে চাহিয়া বলিল, "যা, তাড়াতাড়ি চায়ের কথা ব'লে আয়।"

মুখুজ্জে-মহাশয় পূজোর কথা শুনিয়া কিছু ঘাবড়াইয়া গেলেন। তাঁহার ভ্রূ কুঞ্চিত হইল এবং কপালের উপর তিনটি ভাঁজের উপরে আরও চারিটি দেখা দিল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে আত্মচেতন হইয়া বলিলেন, "তা তো চলবে না—স্নানের আগে তো কিছু খাওয়া চলবে না। বলিতে বলিতে অস্থিরভাবে উঠিয়া ঘরের মধ্যে অবস্থিত বইয়ের আলমারির কাছে গিয়া একে একে বই টানিয়া বাহির করিতে লাগিলেন।

জলধর সঙ্কুচিত ভাবে বলিল, "তা হ'লে ততক্ষণ স্নানের বন্দোবস্ত"—কিন্তু সে কথা তাঁহার কানে প্রবেশ করিল না। তিনি বই দেখিতে দেখিতে হঠাৎ আনন্দে গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "স্ট্রেঞ্জ! এ যে দেখছি আমারই সব খোরাক!—মায় বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত!" তারপর হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "এই একমাত্র খাদ্য যা স্নানের আগে খাওয়া চলে" বলিয়া এক খণ্ড বঙ্কিমচন্দ্র হাতে লইয়া আসনে আসিয়া বসিলেন।

জলধর পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিল, "তা হ'লে স্নানটাই সেরে নিলে হ'ত—চা পর্যন্ত খেলেন না!

মুখুজ্জে-মহাশয় এলোমেলো ভাবে বলিলেন, "তাড়াতাড়ি

কিসের ? চা অবশ্য খাওয়া দরকার—কিন্তু কি জান বাবা, সংস্কারটা তো আর ছাড়া যায় না···কিন্তু ভিতরের তাগিদও কম নয়!—আচ্ছা বরঞ্চ স্নানের আগে এক গ্লাস জল—শাদা জল আমাকে দাও, হাত মুখ ট্রেনেই ধুয়েছি, আহ্নিকটাও বর্ধমান স্টেশনে সেরে নিয়েছি।” কথাগুলি যে একটু অসংবদ্ধ হইল তাহা তিনি নিজেও বুঝিতে পারিলেন।

জলধর বলিল, “শুধু জল খাবেন ?”

মুখুজ্জে-মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, “গলাটা শুকিয়ে গেছে ব'লেই জল খাচ্ছি, নইলে ওটাও তো ঠিক চলে না, খাওয়া তো বটে!” এইবারের কথাটা দৃঢ়তাব্যঞ্জক।

ভৃত্য জল আনিয়া দিল। মুখুজ্জে-মহাশয় জল লইতে গিয়া হঠাৎ হাত গুটাইয়া বলিলেন, “ঐ দেখ, সাংঘাতিক ভুল হয়ে গিয়েছিল—জুতো পায়েই গেলাস ধরতে গিয়েছিলাম!” বলিয়া তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া এক গ্লাস জল উদরস্থ করিলেন। তারপর বই ছাড়িয়া দেওয়ালে-টাঙানো ছবিগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলেন। একখানা রাজারানীর ছবি, একখানা চক্রবর্তী মহাশয়ের এক ইংরেজ বন্ধুর ছবি, আর সব বিলিতি নিসর্গ দৃশ্য। ছবিগুলি খুব মনোযোগের সহিত দেখিয়া মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, “চমৎকার সব ছবি, কিন্তু এর মধ্যে কোথাও বাবা, একখানা দেবদেবীর ছবি ঝুলিয়ে দাও না!—মনে বেশ একটা পবিত্র ভাব জাগবে।”

জলধর কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু তাহা শুনিবার

পূর্বেই মুখুজ্জে-মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "না না না, ওটা আমারই ভুল—বৈঠকখানা-ঘরে দেব-দেবতার ছবি রাখা ঠিক নয়, এখানে ঐ সব ছবিই ভাল।" বলিয়াই ইলেকট্রিক ল্যাম্পের বিচিত্র শেডের দিকে চাহিয়া তাহার রূপ বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন। জলধর কোনোমতেই কোনো দিক দিয়া মুখুজ্জে-মহাশয়কে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া বড় অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

পারিবারিক আবহাওয়ার পরিচয় লইতে আসিয়া মুখুজ্জে-মহাশয় প্রথমেই চক্রবর্তী-মহাশয়ের ধর্মবিষয়ে নিষ্ঠার পরিচয় পাইলেন। সুতরাং তিনি নিজেকে চক্রবর্তী মহাশয়ের আদর্শের উপযুক্ত করিয়া লইতে প্রাণপণ' চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

চক্রবর্তী-মহাশয়ও মুখুজ্জে-মহাশয়ের পত্রে বুঝিতে পারিয়াছিলেন তিনি পারিবারিক আচার-ব্যবহারের পরিচয় লইতে আসিয়াছেন, সুতরাং তিনি পুত্রের পিতা হইয়া কন্যার পিতার চোখে কোনোক্রমেই যাহাতে ছোট না হন এই চিন্তা অন্তরে পোষণ করিতেছিলেন; কাজেই কোথাও কোনও ত্রুটি ধরা না পড়ে সেদিকে তিনিও যথাসম্ভব সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সুতরাং চক্রবর্তী এবং মুখুজ্জে মহাশয়ের মিলনে চক্রবর্তী-গৃহে যেন একটা নূতন পরিমণ্ডল সৃষ্টি হইল।

চক্রবর্তী-মহাশয় কিছুক্ষণের মধ্যেই বৈঠকখানা-ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পায়ে খড়ম এবং পরনে

গরদ। প্রথম সাক্ষাতে উভয় পক্ষ হইতেই আনন্দের যে উচ্ছ্বাস বহিল তাহার অর্থ বিশেষ কিছু ছিল না, কিন্তু তাহার শব্দ বাড়ি কাঁপাইয়া তুলিল। সে শব্দে আকৃষ্ট হইয়া পাড়ার ছোট ছোট ছেলেরা চারি ধারের জানালায় উঁকি মারিয়া একটা বিশেষ রকম নূতনত্বের স্বাদ গ্রহণ করিতে নিযুক্ত হইল।

ট্রেন-ভ্রমণের কথা দিয়া মুখুজ্জে-মহাশয় আলাপ জমাইয়া তুলিলেন। প্রায় আধ ঘণ্টা পর ট্রেন-প্রসঙ্গের পরিণতিস্বরূপ খাদ্যের অনাচার-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল এবং অতি দ্রুতগতিতে আলোচনা প্রাচীন ভারতে গিয়া পৌঁছিল। ঐ সঙ্গে চক্রবর্তী-মহাশয় গড়গড়া এবং মুখুজ্জে-মহাশয় চুরুট টানিতে লাগিলেন, এবং উভয়ের শাস্ত্রালাপে এবং তামাকের ধোঁয়ায় চক্রবর্তী-মহাশয়ের বৈঠকখানা-গৃহে একটা অভিনব কল্প-জগৎ রচিত হইল।

মুখুজ্জে-মহাশয় চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে আরম্ভ করিলেন, "ধরুন, চ্যবন মুনি যে"—বলিয়া পুনরায় চুরুটে মুখ গুঁজিলেন।

চক্রবর্তী-মহাশয় বলিলেন, "জাতিভেদের কথা বলছেন তো?"

মুখুজ্জে-মহাশয় উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, জাতিভেদ সৃষ্টি করেছিলেন, তার অর্থ এ কালের লোকে ভুলেছে বলেই না—!"

চক্রবর্তীমহাশয় আনন্দে প্রায় দিশাহারা হইয়া বলিলেন,

"ধরুন না কেন, শঙ্করাচার্য যে"—বলিয়া ঘন ঘন গড়গড়া টানিতে লাগিলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, "আপনি বোধ হয় স্বপাক আহারের কথা বলছেন?"

চক্রবর্তী-মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ, সেই কথাই তো বলছি। শঙ্করাচার্য স্বপাক আহারকেই প্রশস্ত ব'লে গেছেন, কিন্তু দেখুন তো আমরা তা ক'জন মানি? আমরা যা করছি এটা কি ম্লেচ্ছাচার নয়?"

মুখুজ্জে-মহাশয় গর্জন করিয়া উঠিলেন, "রাইট ইউ আর—ম্লেচ্ছাচার ছাড়া আর কিছু নয়।"

জলধর আর পারিল না, সে বাহিরে গিয়া কিছু হাসিয়া মনটাকে সহজ করিয়া লইল।

মুখুজ্জে-মহাশয়ের মতবাদ ক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর ধ্বনিতে ঘর কাঁপাইতে লাগিল। জলধর পুনঃ প্রবেশ করিয়া স্মরণ করাইয়া দিল, স্নানের সময় হইয়াছে। চক্রবর্তী-মহাশয় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। "কি আশ্চর্য! অতিথির স্নানাহার ভুলে শুধু কথা বলে যাচ্ছি। ছি ছি ছি—ভারি অন্যায় হয়ে গেছে—আর নয়, আর নয়, এবারে উঠুন" বলিয়া নিজে উঠিলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয়ের উঠিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। তিনি বলিলেন, "নট অ্যাট অল্—কিছুমাত্র অন্যায় হয় নি, আপনি আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না।"

চক্রবর্তী-মহাশয় বলিলেন, "অপরাধ নেবেন না, কিন্তু এ-সব বিষয়েরই দোষ—আরম্ভ করলে পুরনো কথা সব মনে পড়ে—" বলিতে বলিতে তাঁহার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল।

মুখুজ্জে-মহাশয় তাহা দেখিয়া অস্থিরভাবে বলিলেন, "না না, স্নানাহার বরঞ্চ এখন থাক, কিন্তু এ সব কথা বিস্তারিত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন ; আরম্ভ করা গেছে, শেষ করতেই হবে।"

কিন্তু শেষ করিবার পূর্বেই একটি দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। মুখুজ্জে-মহাশয় যখন বলিতেছিলেন, "আলোচনা শেষ করতেই হবে," ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁহাদের কানের পাশে এক ঝাঁক মুরগী সমস্বরে কোঁ কোঁ করিয়া উঠিল। চক্রবর্তী-মহাশয় এক লাফে উঠিয়া পড়িলেন। দেখা গেল একটা লোক বাঁকে করিয়া দুই খাঁচা মুরগী আনিয়া জানালার পাশে দাঁড়াইয়াছে। চক্রবর্তী-মহাশয় উন্মাদপ্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "মুরগী! মুরগী আনতে কে বলেছে? আরে হাঁস—হাঁস—হাঁসের স্যুপ খেতে বলেছে ডাক্তার, বেটা মুরগী এনে হাজির—যেন আমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করতে এসেছে। পালা, পালা, এখুনি পালা—ছি ছি ছি—।"

মুরগীওয়ালা কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু চক্রবর্তী-মহাশয় তাহাকে কিছু বলিতে না দিয়া সোজা তাহাকে রাস্তা পর্যন্ত তাড়া করিয়া লইয়া গিয়া আরও অনেকগুলি কথা শুনাইয়া দিয়া আসিলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয় এই সব দেখিয়া সঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। কারণ চক্রবর্তী-মহাশয়ের এই আচরণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া তিনিও চক্রবর্তী-মহাশয়ের সুরে সুর মিলাইয়া বলিতে লাগিলেন, "লোকটার তো স্পর্ধা কম নয়। বাড়ির উপর মুরগী নিয়ে আসে!

চক্রবর্তী-মহাশয় মহা বিরক্তির সুরে বলিলেন, "দেখুন তো কাণ্ড! আরে যে বাড়ির কর্তা মাছ পর্যন্ত স্পর্শ করে না, সেই বাড়িতে মুরগী!—ছি ছি ছি—।"

মুখুজ্জে-মহাশয়ের উৎসাহ এইবার স্বসীমা পার হইয়া গেল। তিনি চক্রবর্তী-মহাশয়কে আনন্দে প্রায় আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "তা হ'লে আমার সঙ্গে হুবহু মিলে গেছেন—আমিও নিরামিষ, আপনিও। ষ্ট্রেঞ্জ কয়েনসিডেন্স!"

চক্রবর্তী-মহাশয় বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কি আশ্চর্য!—আরে হতেই হবে, হতেই হবে। নিরামিষ না হ'লে সম্ভ্রম রাখাই দায়। যেখানেই যান, নিরামিষকে লোকে এখনও একটু মানে। মাছ খেলেন কি তার সঙ্গে পেঁয়াজ খেতে হবে, এবং মাংসের সঙ্গে রসুন।"

মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, "অত্যন্ত সত্য কথা। নিরামিষ একেবারে নিরাপদ, যেখানেই যান সম্মান রাখবার পক্ষে ও একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র। তবে অনেকে আবার নিরামিষ ব'লে একেবারে বিধবার খাদ্য দিয়ে বসে।"

চক্রবর্তী-মহাশয় হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "সে কথা মিথ্যা নয়—তবে এ-বাড়িতে সে ভয় নেই।"

মুখুজ্জে-মহাশয় এ-কথায় গর্জন করিয়া হাসিলেন।

এই সময় জলধর আসিয়া স্নানের জন্য জোর তাগাদা দেওয়ায় আলোচনা ঐখানেই থামিয়া গেল। তখন তেল মাখিতে মাখিতে মুখুজ্জে-মহাশয় আলোচনাটা রাষ্ট্র-বিষয়ের দিকে টানিয়া আনিলেন এবং স্বরাজ সম্বন্ধে তিন-চারি মিনিট ঘোর আলোচনা চলিল। তাহা ছাড়া আহারের সময় আর যে যে প্রসঙ্গ বাকি ছিল সে সমস্তই উথাপিত হইল এবং ঠিক হইল রাত্রিকালে তাহা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হইবে।

ফলত উভয়েই উভয়ের প্রতি মতের গভীর ঐক্যহেতু এরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে দুই জনের মধ্যে অল্পক্ষণের মধ্যেই হাস্যপরিহাস আরম্ভ হইয়া গেল। চক্রবর্তী-মহাশয় বলিলেন, "বুঝলেন মুখুজ্জে-মশাই, আমার ধারণা ছিল মেয়ের বাপ সাধারণত ঘুঘু-চরিত্রের হয়, কিন্তু আপনাকে দেখে আমার ধারণা বদলে গেছে।"

মুখুজ্জে মহাশয় বলিলেন, "আর ছেলের বাপ যে কসাই হয় সেই ধারণা ছিল আমার, কিন্তু ব্যতিক্রম তো চোখের সামনেই দেখছি।"

শেষ পর্যন্ত মুখুজ্জে মহাশয়ের কন্যা চক্রবর্তী গৃহে আসিলে যে পরম সুখের হইবে এবং চক্রবর্তী-গৃহে মুখুজ্জে মহাশয়ের

কন্যাকে পাঠাইয়া যে মুখুজ্জে-মহাশয় নিশ্চিন্ত হইবেন উভয়েই একথা স্বীকার করিলেন।

আহারান্তে নিদ্রার পর বিবাহ সম্বন্ধ একরূপ পাকা হইয়া গেল।

বেলা তখন পাঁচটা। মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, "চক্রবর্তী-মশাই, আমি একটু বেরুতে চাই—বহুকাল পরে কলকাতা এসেছি, দু-এক জন বন্ধুর সঙ্গে দেখা না ক'রে যাওয়াটা ভাল দেখায় না।"

চক্রবর্তী-মহাশয় বলিলেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে—আপনি স্বচ্ছন্দে দেখা ক'রে আসুন। আর দেখুন, ঐ সঙ্গে আমিও একটু ঘুরে আসি না? চলুন আমাদের গাড়িতে একসঙ্গেই বেরুন যাক, চৌরঙ্গীতে আমার একটু কাজও আছে।"

"না না, তা হ'লে আর একসঙ্গে গিয়ে কাজ নেই—আপনার অসুবিধা হবে, আমি বরঞ্চ ট্রামেই যাচ্ছি।"—মুখুজ্জে-মহাশয় ব্যস্তভাবে কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

কিন্তু চক্রবর্তী-মহাশয় ছাড়িলেন না, উভয়ে একসঙ্গেই বাহির হইলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয়ের নির্দেশে গাড়ি ভবানীপুর অভিমুখে চলিল। ভবানীপুরের একটা রাস্তায় কিছুক্ষণ ঘুরিয়া একটা বাড়ির সম্মুখে গাড়ি থামাইতে বলিয়া মুখুজ্জে-মহাশয় সেখানে নামিলেন এবং বলিলেন, "আমি ঘণ্টা দুই পরেই ফিরছি।"

চক্রবর্তী-মহাশয় বলিলেন, "দেখবেন, দেরি করবেন না যেন, আমাদের আলোচনা ঢের বাকী আছে।"

গাড়ি চলিয়া গেল। মুখুজ্জে-মহাশয় ছুটন্ত গাড়ির দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন, এবং গাড়ি অদৃশ্য হইবামাত্র দ্রুত পদচালনা করিয়া রসা রোডে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যে-বাড়ির সম্মুখে গাড়ি থামিয়াছিল সে-বাড়ির সঙ্গে তাঁহার যে কোনো সম্পর্ক ছিল সেরূপ বোধ হইল না।

সেদিন সন্ধ্যা ছয়টায় চৌরঙ্গীর একটা রেস্তরাঁয় পাশাপাশি দুইটি পর্দা-ঢাকা কুঠরিতে বসিয়া দুইজন ভদ্রলোক মনের আনন্দে রোস্ট-চিকেন এবং অন্যান্য নানারূপ মাংসের রান্না উপভোগ করিতেছিলেন এবং মাঝে মাঝে 'বয়' 'বয়' বলিয়া হাঁকিতেছিলেন। কুঠরি দুইটির একটির নম্বর তিন, অপরটির চার। মাঝখানে মানুষ-সমান উঁচু পার্টিশন।

এই দুই ভদ্রলোক অত্যন্ত মাংসপ্রিয়, এবং গৃহে প্রায় প্রত্যহ মাংস খাইয়া থাকেন। শুধু তাহাই নহে, পথেঘাটে যখন যেখানে সুযোগ পান সেইখানেই লোভে পরিয়া মাংসের স্বাদ গ্রহণ করেন। গৃহের রান্নার একঘেয়ে স্বাদ হইতে দূরে থাকিয়া মাঝে মাঝে ইঁহারা এইভাবে রসনাকে তৃপ্ত করেন।

তিন নম্বর প্রথম উৎসাহে যতটা পারেন দ্রুত উদরস্থ করিয়া ধীরে ধীরে একখণ্ড অস্থি চর্বণ করিতেছিলেন, এমন সময় চার নম্বরের কণ্ঠস্বরে তাঁহার মন সচকিত হইয়া উঠিল। মনে হইল এ কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত, কিন্তু কোথায়, কবে শুনিয়াছেন তাহা

মনে পড়িল না। তিনি কৌতূহলবশবর্তী হইয়া মনে করিলেন ভদ্রলোককে একবার দেখা প্রয়োজন। তিনি হঠাৎ ঐখানেই আহার সমাপ্ত করিয়া 'বিল' দিবার জন্য বয়কে ডাকিলেন।

এই কণ্ঠস্বর এইবার চার নম্বরের ভদ্রলোকের কানে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে উতলা করিয়া তুলিল। তিনি সহসা আহার বন্ধ করিলেন। কার কণ্ঠস্বর? অতিপরিচিত অথচ কিছুতেই মনে পড়ে না।

যুগল ভদ্রলোকের যুগপৎ কৌতূহল, অথচ কৌতূহল মিটাইবার উপায় মাত্র একটি। পার্টিশনের উপর দিয়া লুকাইয়া দেখা ছাড়া উপায় নাই। দরজা দিয়া ঢোকা অসঙ্গত, অনুমান যদি ভুল হয়। সুতরাং চেয়ারে দাঁড়াইয়া একটু দেখিয়া লইলেই সন্দেহের অবসান ঘটিবে।

তিন নম্বর চেয়ারে দাঁড়াইয়া অতি সন্তর্পণে পার্টিশনের উপর মাথা বাহির করিলেন। ঠিক সেই সময় চার নম্বরও চেয়ারে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে পার্টিশনের উপর দিয়া মাথা বাহির করিলেন। দুই মাথা নাকে নাকে ঠেকিয়া গেল। চার নম্বর ভীতিজনক শব্দ করিয়া উল্টাইয়া পড়িলেন। তিন নম্বর কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।

ম্যানেজার অকারণ ভয় পাইয়া উভয় ঘরেই তাড়াতাড়ি বিল পাঠাইয়া দিলেন। বিলের পাওনা টাকা মিটাইয়া মুখুজ্জে-মহাশয় ও চক্রবর্তী-মহাশয় দুই কুঠরি হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নীরবে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। চক্রবর্তী-মহাশয়ের

গাড়ি একটু দূরে ছিল, তিনি সেই দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুখুজ্জে-মহাশয় মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন এবং গাড়ির ভিতরে নীরবে তাঁহার পাশে গিয়া বসিলেন। উভয়েরই হাতে এবং মুখে তখনও মাংসের ঝোল লাগিয়া রহিয়াছে।

গাড়ি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ দিয়া ছুটিয়া চলিল। প্রায় তিন মিনিট নির্বাকভাবে চলিবার পর মুখুজ্জে-মহাশয় শুনিতে পাইলেন চক্রবর্তী-মহাশয় আপন মনেই খিক খিক করিয়া



...দুই মাথা নাকে নাকে ঠেকিয়া গেল।

হাসিতেছেন। তাহা শুনিয়া তাঁহার মন হইতে একটা গুরু ভার নামিয়া গেল, তিনিও খিক্ খিক্ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। চক্রবর্তী-মহাশয় পুনরায় গম্ভীর হইয়া গেলেন। মুখুজ্জে-মহাশয়ের মনে পুনরায় আশঙ্কা জাগিল। তিনিও গম্ভীর হইয়া গেলেন। প্রায় দুই মিনিট নীরবে চলিবার পর

চক্রবর্তী-মহাশয় চাদরে মুখ ঢাকিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয়ও হুঙ্কার দিয়া হাসিয়া উঠিলেন। দুই জনের মিলিত হাসিতে ড্রাইভার চঞ্চল হইয়া গাড়ি থামাইয়া ফেলিল এবং পথে নামিয়া হাসিতে লাগিল।

চক্রবর্তী-মহাশয় হাসিতে হাসিতে মুখুজ্জে মহাশয়ের ভুঁড়ি চাপড়াইতে লাগিলেন। মুখুজ্জে-মহাশয় হাসিতে হাসিতে চক্রবর্তী মহাশয়কে জড়াইয়া ধরিলেন।



....হাসিতে হাসিতে ভুঁড়ি চাপরাইতে লাগিলেন।

মিনিট দুই এই ভাবে কাটিবার পর চক্রবর্তী মহাশয় গাড়ি ঘুরাইয়া গঙ্গার ধারে যাইতে আদেশ করিলেন। গাড়ি প্রায় গ্রে স্ট্রীটের কাছে আসিয়াছিল, সেখান হইতে ঘুরিয়া পুনরায় চৌরঙ্গীর দিকে আসিতে লাগিল।

গাড়ি একেবারে ফোর্টের কাছে গঙ্গার ধারে আসিয়া পৌঁছিল। গঙ্গার ধারে বসিয়া উভয়ে উভয়ের কাছে হৃদয় উন্মুক্ত করিলেন।

মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, "তা হ'লে মুরগীওয়ালার ব্যাপারটাও—"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন "সব ফাঁকি; ঐ লোকটাই প্রতিদিন আমাকে মুরগী সাপ্লাই করে।—আর আপনার স্নান না ক'রে খাওয়া?"

মুখুজ্জে-মহাশয় বলিলেন, "আপনার পূজো করার কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, পাছে কোনও অপরাধ নেন। খাওয়া তো বর্দ্ধমানেই সেরে নিয়েছিলাম!"

চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বলিলেন, "পূজো-ফুজো সব মিথ্যা,—তবে ঝোঁকের মাথায় নিরামিষ খাই বলাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আপনি ভবানীপুর থেকে রেস্তরাঁয় এলেন কি ক'রে?

মুখুজ্জে-মহাশয় হাসিয়া বলিলে, "ভবানীপুরের ব্যাপারটাই একটা ব্লাফ—স্রেফ ফাঁকি। নিরামিষ খাওয়া মোটে সহ্য হয় না তাই আপনার হাত থেকে ছাড়া পাবার কৌশল আবিষ্কার করতে হয়েছিল!"

দুই জনের প্রাণখোলা আলাপে এবং হাস্যে গঙ্গার ঘাট আন্দোলিত হইয়া উঠিল। কত কথাই হইল। আমিষ ও নিরামিষ খাদ্যের তুলনা-মূলক আলোচনা হইল; আধুনিক

সমাজের কথা, আধুনিক সভ্যতার কথা, আধুনিক বিজ্ঞানের কথা বিস্তারিত আলোচিত হইল এবং অবশেষে আধুনিক যাবতীয় কিছুর নিন্দা করিতে করিতে উভয়ে উঠিয়া পড়িলেন ; বলা বাহুল্য, আহারের অনাচার সম্বন্ধে ইঁহাদের পূর্বে যে মত জানা গিয়াছিল, এক ঘণ্টা আলাপের পর দুই জনে তাহাতে আরও দৃঢ়বিশ্বাসী হইলেন।

বাড়ি ফিরিয়া রাত্রে দুই জনে নিরামিষই খাইলেন। চক্রবর্তী মহাশয়ের পরামর্শ-মতো এ যাত্রার অভিনয়টা অভিনয়ই রহিয়া গেল।

পরদিন বিদায় গ্রহণ। সকালেই ফিরিবার ট্রেন। যাইবার সময় চক্রবর্ত্তী-মহাশয় বলিলেন, "উভয় পরিবারের চালচলনে যখন এতখানি মিল, তখন এ বিয়ে যে ভগবানের অভিপ্রেত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।"

মুখুজ্জে-মহাশয় কামানের গোলার মতই বিদীর্ণ হইয়া তাঁহার শেষ কথাটি উচ্চারণ করিলেন, "কোনো সন্দেহ নেই—নট্ দি লীস্ট।"

(প্রবাসী, পৌষ ১৩৪৪)

গ্রামোফোন

সাধারণত লোকে অল্পদিনের মধ্যেই কোন্-জাতীয় স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হইয়া ওঠে—পুতুল স্ত্রী না নির্বোধ স্ত্রী, ‘ডল’ স্ত্রী না ‘ডাল্’ স্ত্রী? পুতুল স্ত্রীতে অল্পদিনের মধ্যে বিরক্ত হইবার সম্ভাবনা; আবার নির্বোধ স্ত্রী লইয়াও মুস্কিল। নির্বুদ্ধিতা কিছুদিন কোনরকমে সহ্য করা যায়—বেশি দিন সহ্য হয় না। কেহ কেহ আবার প্রথম দিন হইতেই সহ্য করিতে পারে না। অপর পক্ষে পুতুল স্ত্রীতেও অনেকে প্রথম দিনেই বিরক্ত হইতে পারে। কোন্‌টা ঠিক? বিবাহিত পূর্ণচন্দ্র এই সমস্যার সমাধানে প্রায় ঘামিয়া উঠিয়াছে। সম্মুখে অনেকগুলি সমস্যা ছিল, তাহা প্রায় সমাধান হইয়া এই একটিতে আসিয়া আটকাইয়াছে, ঠিক করিতে পারিলে ঊর্ধ্বসংখ্যা কুড়ি হাজার টাকা পর্যন্ত পুরস্কার পাইবার সম্ভাবনা।

পূর্ণচন্দ্র বলে, “এই একটা নেশা আর কি!”

কিন্তু নিছক নেশা নয়; কিছু পরিমাণ নেশা এবং কিছু পরিমাণ আশা সম্মিলিত ভাবে পূর্ণচন্দ্রকে ক্রস্-ওয়ার্ডের কালিমায় কলঙ্কিত করিয়াছে। এক বৎসর পূর্বে এই ক্রস্-ওয়ার্ডে সে নগদ পঞ্চাশটি টাকা পুরস্কার পাইয়াছিল; তদবধি নিয়মিতরূপে সে ঘর পূরণ করিয়া আসিতেছে।

বলা বাহুল্য এই এক বৎসর তাহার নিজের ঘরের কোনো অভাব পূরণ হয় নাই।

কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় স্ত্রীর জাতিবিচার করিতে করিতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে পাশের বাড়ির নূতন ভাড়াটিয়া-পরিবার হইতে দারুন জোরে এক গ্রামোফোন বাজিয়া উঠিয়া পূর্ণচন্দ্রের ক্রস্-ওয়ার্ডের আশা, তাহার ভবিষ্যৎ, তাহার চিরজীবনের সাধনা, তাহার বাঁচিয়া থাকিবার আনন্দ—সমস্তই নষ্ট করিয়া দিল। উত্তর পাঠাইতে আর একটি দিন মাত্র সময়, অথচ এই বর্বরতা!

আরম্ভ হইল তো আর থামে না! পালা শেষ হইতে না হইতে গান, গানের শেষে বাঁশী, বাঁশীর শেষে সেতার, সেতারের শেষে আবার পালা—মানুষের প্রতি মানুষের অবিচার পূরা একঘণ্টাতেও শেষ হইল না। পুর্ণচন্দ্র সংসার বিষয়ে বীতশ্রদ্ধ হইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। 'ডল্' স্ত্রী না 'ডাল্' স্ত্রী—এই গোলমালে কে তাহার উত্তর দিবে?

পুষ্পবাণে জর্জরিত শিব তপস্যার মাথায় লাথি মারিয়া উঠিয়া পড়িয়াছেন, কুমারসম্ভবের এই দৃশ্যটি তখন রেকর্ডে অভিনীত হইতেছিল। পূর্ণচন্দ্রও ঠিক সেই মুহূর্তে ভগ্নতপস্যা হইয়া উঠিয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল, পাশের বাড়ি হইতে তপস্যাভঙ্গকারী উপদ্রবকে আনিয়া উনুনে নিক্ষেপ করে।

এদিকে উমাও ঐ গ্রামোফোনের কথাই ভাবিতেছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টা ভাবে।

গ্রামোফোন এমন একটা জিনিষ যাহা কাঁদে, হাসে, গান গায়, কথা বলে, বক্তৃতা দেয়, অভিনয় করে—যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই তাহাকে দিয়া বলানো যায়, খুশি মতো চুপ করাইয়া রাখা যায়; অনেকটা সন্তানেরই মতো। দুধ খাওয়াইলেই নিশ্চিন্ত! এত চমৎকার অথচ এত শস্তা!

উমা নিজের চেষ্টায় এতখানি বুঝিয়াছে, তাহা ছাড়া পাশের বাড়ির গৃহিণী এ বিষয়ে তাহাকে যতদূর সম্ভব উৎসাহ এবং উৎসাহের সঙ্গে একখানি সচিত্র ক্যাটলগ দিয়াছে।

তাই অতি উচ্ছ্বাসে এবং অতি আনন্দে পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই উমা বলিয়া ফেলিল, "একটা গ্রামোফোন কিনিলে বেশ হয়।"

এই কথায় পূর্ণচন্দ্র স্তম্ভিত হইল। বিপন্নও হইল কম নয়। কিন্তু তবু সে নিজের মনোভাব গোপন করিতে পারিল না। বেশ একটু কঠিন ভাবেই বলিল,—"বল কি! গ্রামোফোনের মতো একটা কুৎসিত জিনিষ তুমি কিন্‌তে চাও?"

কথাটা উচ্চারণ করিয়া পূর্ণচন্দ্রের যেমন দুঃখ হইল, তেমনি আনন্দও হইল। সামান্য কারণে উমার মনে আঘাত দিতে হইল, দুঃখের কারণ ইহাই। কিন্তু আঘাত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়াতে সে মনে মনে খুশি হইল।

খুশির আরও কারণ ঘটিল এই যে, ঠিক এই সময় মহা ঘটা করিয়া পাশের বাড়িতে শিবের বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হইয়া গেল, এবং গ্রামোফোন আর বাজিল না। সুতরাং গোলমাল থামিয়া যাওয়াতে পুর্ণচন্দ্র আত্মদর্শনে মনঃসংযোগ করিবার সুযোগ পাইল। প্রথমেই তাহার মনে একটি প্রশ্ন জাগিল এই যে, কেন সে উমাকে আঘাত দিল? তবে কি ক্রস-ওয়ার্ড একটা নেশা?

পূর্ণচন্দ্রের মনটা দমিয়া গেল। শেষে তাহার অনুতাপ হইল। সে উমার কাছে গিয়া নরম সুরে বলিল, "কিছু মনে ক'রো না, গ্রামোফোন একটা কালই কিনে আনব।"

উমা সহজ সুরেই বলিল, "কোনো দরকার নেই।"

"তুমি চেয়েছ"—

"এখন আর চাই না।"

"গ্রামোফোন আমার নিজেরই দরকার আছে।"

উমা বিরক্ত হইয়া বলিল, "ফের যদি গ্রামোফোনের কথা তোল তো আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাব।"

পূর্ণচন্দ্র নিজের জালে আটকাইয়া পড়িয়াছে, তবু যতদূর সম্ভব জাল কাটিবার শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, "চল দুজনেই যাই, দোকান এখনও খোলা আছে, তুমি পছন্দ ক'রে দেবে।"

কথাটায় জাল কাটিল না, উপরন্তু জাল জটিল হইয়া উঠিল। কারণ, তাহার পর নিম্নলিখিতরূপ আলাপ হইল।

উমা বলিল, "তোমার ইচ্ছে নেই, তুমি দয়া ক'রে কিনবে, সে হবে না।"

"দয়া নয় উমা।"

"কিন্তু তুমি ভুল করছ, আমি কিছুই চাই না।"

"তা হ'লে গ্রামোফোন—"

"না।"

"কোনো দিন না?"

"না।"

"তবে আমিও প্রতিজ্ঞা করছি, কোনোদিন গ্রামোফোনের কথা তুলব না।"

আমিও না।"

"আমি গ্রামোফোন স্পর্শ করব না।"

"আমিও না।" বলিয়া উমা রান্নাঘরের কাজে মনোনিবেশ করিল।

কথা শেষ করিয়া পূর্ণচন্দ্রও এই মনে করিতে করিতে শয়নগৃহের দিকে রওনা হইল যে, এ একরকম ভালই হইল, গ্রামোফোনের অধ্যায় অন্তত এইখানেই শেষ—

কিন্তু এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই ধারণাটা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়া গেল। পূর্ণচন্দ্র "ক্যাঁক" জাতীয় একটি শব্দে চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিল, উমার প্রিয়তম বিড়ালটি রান্নাঘর হইতে সজোরে নিক্ষিপ্ত হইয়া পূর্ণচন্দ্রের পিছন দিকে হঠাৎ চিৎ হইয়া পড়িয়াছে। বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে উমার মন শান্ত হয়

নাই। নিরপরাধ বিড়াল এই সংবাদটি বহন করিয়া আনিল।

মানুষের যেখানে শেষ, ভগবান সেইখান হইতে শুরু করেন। কথাটা সত্য। কারণ, ইহার পর পূর্ণচন্দ্রের গৃহ-সীমানার মধ্যে স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হইলেন। তাহার প্রমাণ এই যে পরদিন সকালের ডাকে একখানা চিঠি আসিয়া পূর্ণচন্দ্রকে জানাইয়া দিল যে—গতমাসের ক্রস্-ওয়ার্ডের যে উত্তর সে পাঠাইয়াছিল তাহাতে একটি ভুল ছিল—সুতরাং একটি ভুল হইলে যে পুরস্কার পাওয়া উচিত তাহাই সে পাইয়াছে; পুরস্কারটি একটি গ্রামোফোন।

চিঠি যখন আসে, সেখানে উমা উপস্থিত ছিল। চিঠি পড়িবার সময় পূর্ণচন্দ্রের হাতে যে স্নায়বিক কম্পন দেখা দিয়াছিল, উমা তাহা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া ক্ষণকালের জন্য পূর্বদিনের সকল কথা বিস্মৃত হইল। সে প্রায় কাঁদিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ওগো ও কিসের চিঠি—ওতে কি আছে।"

পূর্ণচন্দ্র কিছুই বলিতে পারিল না। তাহার প্রিয় কুকুরটি হাঁটুতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া চিঠিখানা পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল—হঠাৎ দেখা গেল কুকুরটি তিন হাত শূন্যে উঠিয়া চিৎ হইয়া নিচে পড়িল। অত্যন্ত বিরক্তিতে পূর্ণচন্দ্র কুকুরটিকে লাথি মারিয়া সরাইয়া দিল। উমা শঙ্কিত হইয়া

উঠিল। কিন্তু পূর্ণচন্দ্র কিছুই বলিল না। উমাও কিছু জিজ্ঞাসা করিল না, বুঝিল অফিস সংক্রান্ত কিছু—তাহার জানিবার দরকার নাই। প্রথম ধাক্কাটা কাটাইয়া উঠিয়া পূর্ণচন্দ্র সন্ধ্যা বেলা উমাকে সব বলিল। উমা শুনিয়া গম্ভীর হইয়া গেল।



....কুকুরটি চিৎ হইয়া নিচে পড়িল।

ক্রস্‌-ওয়ার্ডের একটি ভুল পূর্ণচন্দ্রের নিকট জীবনের সর্বপ্রধান একটি ভুল বলিয়া মনে হইল, কিন্তু ইহাতে তাহার হাত ছিল না।

কদিন পরে রেলষ্টেশন হইতে প্রকাণ্ড কাঠের বাক্সের প্যাকে গ্রামোফোন আসিয়া বাড়িতে পৌঁছিল। উমা দূর হইতে দেখিল, কাছে আসিবার প্রয়োজন বোধ করিল না। পূর্ণচন্দ্র প্যাকিংসুদ্ধ গ্রামোফোন বারান্দার একপাশে রাখিয়া

দিল, খুলিবার প্রয়োজন বোধ করিল না। গ্রামোফোনটি সে না লইতে পারিত, অন্যকে দান করিতে পারিত, কিন্তু গ্রামোফোন পাওয়াটাই হইল তাহার পক্ষে ভয়ঙ্কর একটা পরাজয়। রাজনীতিক্ষেত্রের পরিচিত কথাটা তাহার এই সময় মনে পড়িল, "ক্যান নাইদার অ্যাক্‌সেপ্ট নর রিজেক্ট।" কমুন্যাল অ্যাওয়ার্ডের মতোই গ্রামোফোনটি আপনার স্থান দখল করিয়া লইল।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যে পূর্ণচন্দ্র এবং উমার মধ্যে যে বাক-সংযম দেখা দিল, তাহাতে খুব সম্ভব প্যাকিঙের ভিতর গ্রামোফোনটিও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। শুধু পাশের বাড়ির নির্লজ্জ যন্ত্রটি শ্রান্তিহীন বাজিয়া চলিল।

গ্রামোফোন স্পর্শ করিব না—এই প্রতিজ্ঞা দ্বারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার সাময়িক ব্যবধানটি সহজেই দূর হইয়া যাইত, কিন্তু উভয়ের মধ্যে গ্রামোফোনরূপ পর্বত আসিয়া চাপিয়া বসিল। পর্বতদুহিতা উমাও তাহা অতিক্রম করিয়া পূর্ণচন্দ্রকে দেখিতে পাইল না! যথাসম্ভব উভয়ে উভয়কে এড়াইয়া চলে; দেখা হইলে পাছে গ্রামোফোনের কথা ওঠে এই আশঙ্কায় উভয়ে সঙ্কুচিত। এই সব কারণে কয়েক দিনের মধ্যে পূর্ণচন্দ্রের গৃহপরিমণ্ডলের গুমোট ভাবটি নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠিল। বেচারা পূর্ণচন্দ্র চাকরি করিয়া খাইত, তাহার পক্ষে রাজনীতি সহিবে কেন?

পূর্ণচন্দ্র নানারূপ গ্লানিতে ম্রিয়মান হইয়া স্থানত্যাগের

আয়োজন করিল। বদলি হওয়াও কঠিন হইল না। পাশের বাড়ির গ্রামোফোনের অত্যাচার হইতে দূরে না গেলে নিজের বাড়ির গ্রামোফোন সম্বন্ধে কিছুই করা যাইবে না ইহা সে নিশ্চিত বুঝিয়াছিল।

কিন্তু নূতন জায়গায় আসিয়া উমার কিছু মাত্র পরিবর্তন হইল না। গ্রামোফোন মন হইতে দূর করিবার জন্য উমা যে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা যেন আরও কঠোর হইয়া উঠিল। তাহার একটি প্রমাণ এই যে, যে-ঘরে গ্রামোফোনের পার্সেল ছিল, উমা সে ঘরে এক দিনের জন্যও গেল না। কিন্তু একটি ব্যাপারে সে বড় ঘাবড়াইয়া গেল। আরও একটি নতুন প্যাকেট কোথা হইতে আসল? সংসারের যাবতীয় জিনিস তাহার পরিচিত, তাহা ছাড়া প্রত্যেকটি জিনিসই তো সে নিজ হাতে প্যাক করাইয়াছে। পূর্ণচন্দ্র তাহাকে লুকাইয়া এমন কি আনিতে পারে? আর…আর…যদি আনিয়াই থাকে তাহা হইলেই বা তাহার কি? উমা নিজের মনকে ক্রমাগত বলিল, "মন, তুমি ওদিকে দৃষ্টি দিও না, দিও না, দিও না।"

কিন্তু কি আশ্চর্য মন! সে দিকেই ক্রমাগত তাহার আকর্ষণ! উমা মনের চোখ চাপিয়া ধরিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল, "কি এমন দায় পড়েছে তোমার! ভারি তো! উনি লুকিয়ে যা ইচ্ছে আনতে পারেন, তাতে তোমার কি, তোমার কি, হতভাগী তোর কি?"

এইভাবে মনকে যত বুঝাইতে লাগিল, মন ততই অবুঝ হইয়া উঠিল, এবং শেষ পর্যন্ত মনের সঙ্গে পা আসিয়া যোগ দিল। মনকে বুঝাইতে বুঝাইতে উমা ক্রমশ অগ্রসর হইয়া প্যাকেটটি স্পর্শ করিল। মনে হইল আছাড় মারিয়া ভাঙিয়া ফেলে, কিন্তু ভয়ানক ভারী। তাহা হইলে কাটিয়া ফেলা যাক। উমা দা লইয়া প্যাকেটের একটা কোণ চাপ দিয়া খুলিয়া কেলিল, তারপর সমস্ত ঢাকনাটাই খুলিল!

প্যাকেট ভর্তি গ্রামোফোন-রেকর্ড!

অভিভূত উমা একখানা করিয়া রেকর্ড তুলিয়া দেখিতে লাগিল। সব আছে! পাশের বাড়িতে যে-যে 'রেকর্ড ছিল, সব আছে—সব আছে! তা ছাড়াও আরও অনেক আছে! কিন্তু···কিন্তু···এ সব কেন? যাহা সে স্পর্শ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহা দেখিয়া তাহার এত আহ্লাদ কেন? উঃ কি ষড়যন্ত্র! উমাকে হার মানাইবার জন্য পূর্ণচন্দ্রের গোপন ষড়যন্ত্র! ইহা সে কিছুতেই সহ্য করিবে না। এ আপদ দূর করিতে হইবে। পোড়া কপাল গ্রামোফোনের।

কিন্তু দূর করিবার আগে পূর্ণচন্দ্রের সঙ্গে বোঝাপাড়া করা দরকার। উমা তাহার পরাজয়ের সাক্ষীস্বরূপ একগোছা রেকর্ড লইয়া পূর্ণচন্দ্রের সম্মুখে ভাঙিয়া গায়ের জ্বালা জুড়াইবে। উমা একগোছা রেকর্ড হাতে লইল। তারপর লোকে আত্মহত্যা করিবার পূর্বে যেমন করিয়া মনকে

মোহগ্রস্ত করে, তেমনি সেও নিজের মনকে মোহগ্রস্ত করিয়া তুলিল! ভালমন্দ বিচার করিল না, ঘর হইতে দ্রুত বাহির হইয়া পড়িল।

ইহার পরবর্তী ইতিহাস অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।

বাহির হইয়াই উমার সমস্ত দেহমন হিম হইয়া গেল। সে দেখিতে পাইল একটি পাষাণ মূর্তি একটি পাষাণের গ্রামোফোন ঘাড়ে লইয়া নিশ্চল দাঁড়াইয়া আছে। এই মূর্তি আসিল কোথা হইতে?



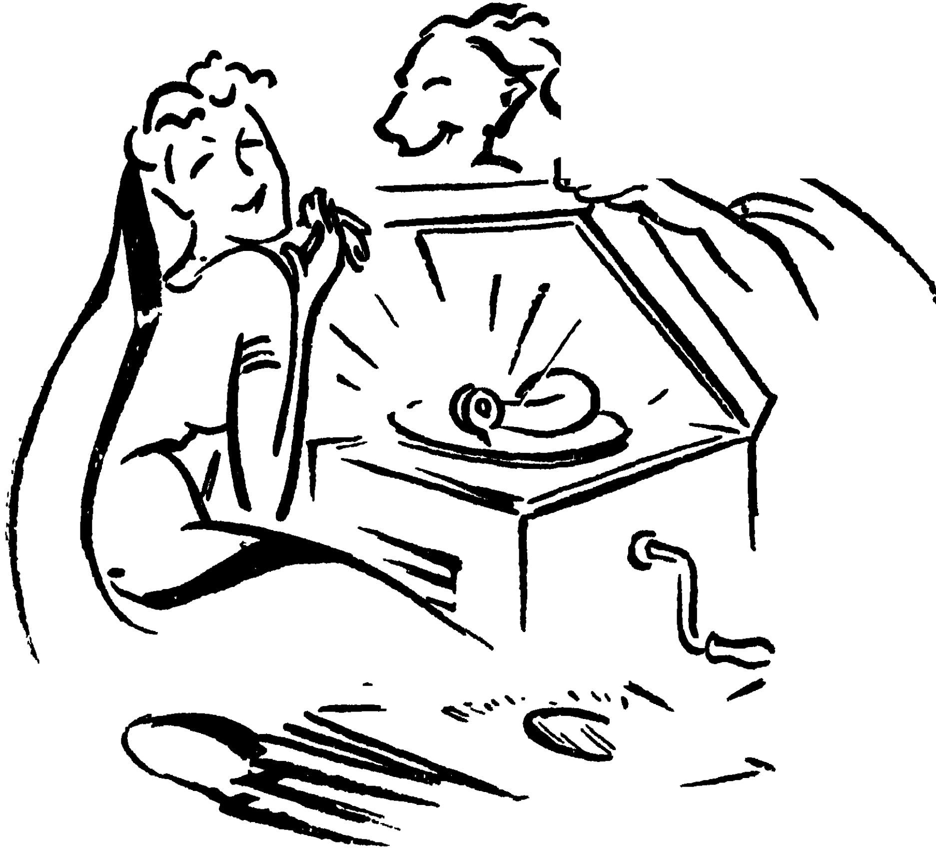
…উমার শরীর কাঁপিতে লাগিল।

উমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল, তাহার কথা বলিবার ক্ষমতা লুপ্ত হইল। ভূত সে পূর্বে কখনও দেখে নাই, এই প্রথম। দেখিয়া উমা রেকর্ড-হাতে কাঁপিতে কাঁপিতে মাটিতে বসিয়া পড়িল। মনে হইল এখনই মূর্ছিত হইয়া পড়িবে।

তাহা দেখিয়া ভূত ঘাড় হইতে গ্রামোফোনটি নিচে নামাইয়া সংক্ষেপে বলিল, "এইখানেই বাজাও।"

স্তম্ভিত উমা কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তারপর দ্রুতস্পন্দিত হৃদয়ে সংক্ষেপে বলিল, "দম দিয়ে দাও, আমি আবার ও সব ভাল জানি না।"

প্রথমে কুমারসম্ভব বাজিল, তারপর সম্ভব অসম্ভব সব



....ভূত সংক্ষেপে বলিল, "অদ্ভুত।"

রকম গান, বাঁশী, সেতার, পালা সবই বাজিল। এই ভাবে পরদিন বেলা আটটা পর্যন্ত গ্রামোফোন এবং দেয়ালের ক্লক

ঘড়িটি সমানে বাজিয়া চলিল। বাজার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষার মেঘ কাটিয়া গিয়া উমার চিত্তাকাশে শরতের সূর্য সোনালি রঙে ঝলমল করিয়া উঠিল। বেলা আটটায় যখন গ্রামোফোন থামিল তখন উমা গদগদ স্বরে বলিল, "সুন্দর।"

ভূত সংক্ষেপে বলিল, "অদ্ভুত।"

(আনন্দ বাজার পত্রিকা, পূজা সংখ্যা, ১৯৩৭)

শব্দ-সঙ্ঘাত

আকাশে গ্রহ উপগ্রহ নিয়ত ঘূর্ণিত হইতেছে এবং আকাশে তজ্জনিত প্রচণ্ড শব্দ হইতেছে। আমরা সেই শব্দ শুনিতে পাই না, কিন্তু ভগবান কি সেই শব্দ শুনিতে পান?



যদি শুনিতে পান এবং শুনিয়াও দূরে না পালান তাহা হইলে তাঁহার সহনশীলতাকে প্রশংসা করিতে হয়।

কিন্তু ভগবান সম্বন্ধে কিছুই না জানিয়া আর কোনো মন্তব্য করা শোভন হইবে না। আমার নিজের কথাই বলি।

যে রাজপথপার্শ্বস্থিত বাড়িতে অল্পদিন পূর্বে ছিলাম তাহার পাশে বাস্-এর আড্ডা। বাস্-এঞ্জিনের শব্দ এবং বাস্-চালকের কোলাহল কিছুদিনের মধ্যেই অসহ্য হইয়া উঠিল, সুতরাং বাসস্থান ত্যাগের আয়োজন করিতে লাগিলাম।

অনুসন্ধানের পর মনের মতো একটি বাড়ি পাওয়া গেল। একদিন রবিবার সকালে সপরিবার সেই বাড়িতে আসিয়া উঠিলাম।

বড় রাস্তা হইতে একটি ছোট রাস্তা বাহির হইয়াছে, এবং তাহা অপেক্ষাও ছোট আর একটি গলি এই ছোট রাস্তা হইতে বাহির হইয়া একটি অনতিপ্রশস্ত মাঠে আসিয়া শেষ হইয়াছে। মাঠের ওপারে ছোট মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়, এবং আমাদের বাড়ির একটি দিক সেই মাঠের দিকে খোলা।

অত্যন্ত নিরীহ এবং অত্যন্ত অন্তর্মুখী এই গলিটিকে এবং তাহার উপরের এই বাড়িটিকে আবিষ্কার করিয়া অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিলাম। মনে হইল যেন পল্লীগ্রামে আসিয়া পড়িয়াছি। এমন কি, অতি শব্দ হইতে অতি নির্জনতার মধ্যে পড়িয়া কিছুক্ষণ মনটা একটু দমিয়াও গিয়াছিল। প্রাণান্তকর শব্দের নিরাপদ আবেষ্টনে আমরা সপরিবারে যে সশব্দ আলাপে অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছিলাম তাহা সহসা বাধাগ্রস্ত হওয়াতে স্বরযন্ত্র যেন পীড়িত হইয়া উঠিল। চুপে চুপে গৃহিণীকে বলিলাম, কথাটা একটু আস্তে বলতে হবে, এখানে কিন্তু বাস্ নেই।

গৃহিণী আমাকে দৃষ্টিদ্বারা তিরস্কৃত করিয়া আরও মৃদুস্বরে বলিলেন, অত চেঁচিও না, পাশের বাড়ির লোকেরা কান পেতে আছে।

কিন্তু তাহারা বেশিক্ষণ কান পাতিয়া রহিল না।

ঘণ্টাখানেক পরে গলির মধ্যে একটা মোটর গাড়ি সশব্দে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিতেই আমাদের ফ্ল্যাটের ঠিক নীচেই যে গারাজ্ ছিল তাহার টিনের দরজা ঝন্ ঝন্ কড় কড় কড়াৎ করিয়া খুলিয়া গেল, গাড়ি গারাজে প্রবেশ কারল এবং দরজা পুনরায় উক্তরূপ শব্দ করিয়া বন্ধ হইল। আরও কিছু পরে তাহার বিপরীত দরজা হইতে অর্থাৎ গলির ওপারের গারাজ হইতে আর একখানি গাড়ি উক্তরূপ শব্দ-সমূহের প্রত্যেকটি অনুকরণ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

বেলা তখনও বেশি হয় নাই, বোধ করি নয়টা হইবে। আমাদের ফ্ল্যাটের পূর্বদিকে পাঁচ ছয় হাত ব্যবধানে যে বাড়িটি অবস্থিত তাহার অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য গৃহিণী আদেশ করিলেন পর্দা কিনে আন। ঠিক এই সময় সেই বাড়ির একটি জানালায় গ্রামোফোন বাজিয়া উঠিল। এবং আরও কয়েক মিনিট পরে তাহার পাশের জানালায় রেডিওতে সানাই বাজিয়া উঠিল। দুইটি পৃথক পরিবারের দুইটি জানালা। কিন্তু তাহাদের মাঝখানে দেওয়াল আছে বলিয়া গ্রামোফোন ও রেডিওর সত্তা তাহাদের কাছে পৃথক, কিন্তু দুই নমস্য বৈজ্ঞানিকের দুইটি বিস্ময়কর আবিষ্কারের

মিলিত ফল যে একই সঙ্গে আমাদের এই বাড়িটিকে একা ভোগ করিতে হয় ইহা তাহাদিগকে বুঝাইবার উপায় নাই।

সুতরাং যন্ত্র-সঙ্গীতকে মানিয়া লইলাম।

গৃহিণীকে বলিলাম পর্দা আর কিনতে হবে না, আমাদের জানালা দুটোই স্থায়ীভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

গৃহিণীর তাহাতে আপত্তি হইল। তিনি বলিলেন তবু তো এটা মানুষের আওয়াজ, বাস্-এর আওয়াজের চেয়ে ঢের ভাল।

সুতরাং পর্দার কাপড় কিনিতে হইল। আমি শব্দের বিরুদ্ধে কাঠের জানালার বাধা সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু সন্ধ্যায় আর একটি বৃহত্তর শব্দসমস্যার সম্মুখীন হইয়া কাঠকে বিস্মৃত হইলাম। এ শব্দটি ইট ভেদ করিয়া আমাদিগকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। বোধ হইল যেন আমাদের উপরের ফ্ল্যাটে কেহ নৃত্য করিতেছে। ইতিপূর্বে বহুপ্রকার শব্দের অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করিয়াছি কিন্তু মাথার উপর কেহ নৃত্য করিলে মনের কি অবস্থা হয় তাহা জানা ছিল না।

গৃহিণী কিন্তু দমিলেন না। তিনি বলিলেন, তবু তো মানুষের আওয়াজ, তোমার ইঞ্জিনের চেয়ে ঢের ভাল। ভাল কি, এবং মন্দ কি, তাহার তুলনামূলক আলোচনা করিবার আর প্রবৃত্তি হইল না, আমি সোজা উপরে উঠিয়া গিয়া অপরিচিত দরজার কড়া নাড়িলাম। একটু পরেই একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসিয়া দরজা খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কাকে খুঁজছেন?

আমি যে সৌভাগ্যবশত তাঁহাদেরই নীচের ফ্ল্যাটটি ভাড়া লইয়াছি তাহা বিনীতভাবে প্রকাশ করিয়া বলিলাম, দেখুন, আপনাদে ফ্ল্যাট থেকে দুপ্‌দাপ্‌ একটা শব্দ হচ্ছে, যদি কিছু মনে না করেন—

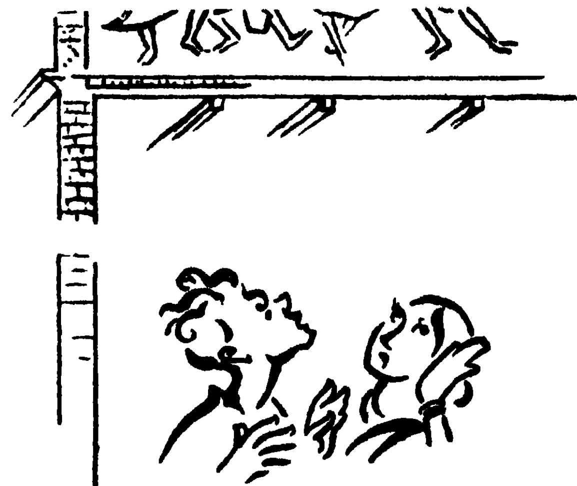
কথাটি শেষ করিতে না দিয়াই ভদ্রলোক হাসিয়া বলিলেন, মেয়েরা নাচ শিখছে !

বলিলাম, নাচে কি এত শব্দ হয়? আজকালকার নাচে তো—

ভদ্রলোক পুনরায় আমার অসমাপ্ত কথাটি পরিপূরণ করিয়া বলিলেন—হ্যাঁ আজকালকার নাচে দেহভঙ্গিটাই বেশি, পায়ের কাজ নেই বললেই চলে, কিন্তু আপনি কি সব নৃত্য দেখেছেন ?

আমি লজ্জিতভাবে বলিলাম, আজ্ঞে না।

ভদ্রলোক বলিলেন, তবেই বুঝুন।



আমার আর বলিবার কিছু রহিল না। শুধু বলিলাম, নৃত্যে আমার যথেষ্ট সমর্থন আছে, তবে ছাদটা না ভাঙে সেইটে একটু লক্ষ্য রাখবেন।

ভদ্রলোক দরজা বন্ধ করিতে করিতে বলিলেন, দেখুন নাচ সম্বন্ধে অনেক সংস্কার ভাঙতেই শক্তি ফুরিয়ে গেছে—ছাদ

ভাঙবার আর উৎসাহ নেই।—একটু অসুবিধা যদি হয় সহ্য করুন, এ নিয়ে আর দুশ্চিন্তা করবেন না।

দুশ্চিন্তা আর করিলাম না, নৃত্যটাকেও মানিয়া লইলাম। তাহা ছাড়া মনোযোগ কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্য দিকে আকৃষ্ট হইল।

স্কুলের দারোয়ান স্কুলের সম্মুখস্থ মাঠে লণ্ঠন লইয়া বসিয়া সুর করিয়া ধর্মকাব্য পাঠ করিতে লাগিল। যে সুরে পাঠ চলিল তাহা পরিচিত কোনো সুরের সঙ্গেই মেলে না এবং সে কণ্ঠস্বরকেও কেহ মধুর বলিয়া ভুল করিবে না, রূঢ় তীক্ষ্ণতায় তাহা গ্রামোফোন, রেডিও এবং নৃত্য-শব্দকে অতিক্রম করিয়া গেল।

গৃহিণীকে বলিলাম দারোয়ানের আবৃত্তিটা কিন্তু আমার কাছে খুব ভালই লাগছে। কিন্তু আমার এই মন্তব্য বিদ্রূপাত্মক মনে করিয়া গৃহিণী বলিলেন, তুমিই তো দেখে শুনে বাড়ি নিয়েছ, এখন আপত্তি কেন? বেশ তো তোমার যদি ভাল লাগে, আমারও লাগবে।

বুঝিলাম, মানুষের শব্দ হইলেও গৃহিণীর ধৈর্যসীমা ভাঙিবার মুখে।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে কাব্য-পাঠও পুরাতন হইয়া গেল। গলির বিপরীত বাড়িতে এই সময় এমন একটি ব্যাপার আরম্ভ হইল যাহা নিতান্তই অপ্রত্যাশিত। আপাত-দৃষ্টিতে যাহাদিগকে অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় একটি ভদ্র পরিবার বলিয়া মনে

হইয়াছিল, তাহারা হঠাৎ অভদ্র ভাষায় কলহ শুরু করিয়া দিল। পারিবারিক কলহ! আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এক সঙ্গে চীৎকার করিতেছে, মেয়েরা কেহ কেহ মার খাইতেছে, পিতা পুত্রকে মারিতেছে, পুত্র পিতাকে মারিতেছে! প্রায় তিনঘণ্টা এই কুৎসিত দৃশ্যের অভিনয় চলিল। রাত্রি তখন একটা!

সকালে উঠিয়া ভগবানকে এই বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইলাম যে এ অঞ্চলের আকাশে যে সূর্যটির উদয় হইল সে অন্ততঃ তাহার চিরাচরিত রীতিতে নীরবেই উদিত হইয়াছে—উদয়ের সময় উদয়শঙ্করকে স্মরণ করে নাই অথবা স্তোত্র-পাঠ করে নাই!

সোমবার সকাল। মেয়েদের স্কুল সকালেই বসে। বাস বোঝাই হইয়া মেয়েরা আসিতেছে। তাহাদের কোলাহল দিয়াই শুভদিনের আরম্ভ হইল।

উপরে যে ফ্ল্যাটে সন্ধ্যায় মেয়েদের নৃত্য আরম্ভ হইয়াছিল, সেই ফ্ল্যাটের এক ভদ্রলোক হারমনিয়াম লইয়া সুর সাধনা আরম্ভ করিলেন। ভৈরবীর সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায় এমন ভয় বোধ করি তাঁহার ছিল, সেই জন্য তাঁহার ভৈরবীর সঙ্গে তিনি একখানি রেলোয়ে এঞ্জিন জুড়িয়া দিলেন; সুর ঘণ্টায় ৬০ মাইল বেগে ছুটিয়া চলিল।

বাস্‌-এর একঘেয়ে শব্দে অভ্যস্ত ছিলাম, সেই শব্দ হইতে দূরে আসিয়া বহুবিচিত্র শব্দের চমকপ্রদ সৌন্দর্যে মনে ধাঁধা

লাগিয়া গেল। তারপর কিছুদিনের মধ্যে ইহাতেও অভ্যস্ত হইয়া উঠিলাম, এবং বৈচিত্র্যের মোহও ক্রমশ কাটিয়া যাইতে লাগিল। আমরা উভয়েই বুঝিতে পারিলাম, ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, এবং শব্দও তাই, সুতরাং শব্দকে এড়াইবার উপায় নাই। হয় তো বা মৃত্যুর পরে আর এক শব্দরাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে! তবে হয় তো সে শব্দ পৃথিবীর শব্দ অপেক্ষা উন্নত, অর্থাৎ ইহার মতো অর্থহীন নহে। শব্দ এবং অর্থ হয় তো সেইখানেই এক হইয়া মিলিয়াছে।

আমাদের শুইবার ঘরের জানালা বালিকা বিদ্যালয়ের মাঠের দিকে খোলা। আমাদের বাড়ির পাশ দিয়া যে গলিটি এই মাঠে আসিয়া শেষ হইয়াছে, সেই গলির ওপারে আমাদের বাড়ির বিপরীত দিকে যে বাড়ি তাহার দরজা এই মাঠের দিকে খোলা। আমাদের জানালা হইতে সে দরজা দেখা যায় না, অথচ তাহার দূরত্ব মাত্র কুড়ি কি পঁচিশ হাত হইবে।

কিন্তু এই বাড়ি হইতে কয়েকদিন পরেই যে শব্দ আসিতে লাগিল সেই শব্দই আমাকে শেষ পর্যন্ত নৈঃশব্দ্যে লীন করিয়াছে।

এ শব্দ মানবকণ্ঠ নিঃসৃত হইলেও অমানুষিক, এবং তাহার প্রমাণ, যাঁহারা যন্ত্রশব্দ এবং নৃত্যশব্দ সৃষ্টি করিয়া ক্রমাগত

একটি শান্ত পরিবারকে অশান্ত করিতেছিলেন তাঁহারাও এই শব্দের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।

কণ্ঠস্বরের মালিকের বয়স পনের ষোল বৎসরের বেশি হইবে না, কিন্তু তাহার স্বর-যন্ত্রটির শক্তি মানব-শক্তিকে অতিক্রম করিয়া অশ্বশক্তির সীমানায় পৌঁছিয়াছে। তদুপরি গলাটি ভাঙা।

খুব সম্ভব তাহারা ঐ বাড়িতে নূতন আসিয়াছে, তাই ইহার কণ্ঠস্বর পূর্বে শুনিতে পাই নাই। সে সন্ধ্যা সাতটা হইতে ক্রমাগত বাংলা দৈনিকের সমস্তগুলি পৃষ্ঠা চীৎকার করিয়া পড়িতে আরম্ভ করে। সমস্ত বিজ্ঞাপন, সমস্ত সংবাদ, এবং সম্পাদকীয়। কাগজ পড়া শেষ হইলে পথে সংগৃহীত বিজ্ঞাপনের হ্যাণ্ডবিল পাড়তে আরম্ভ করে।

কোথায় কোন্ গণৎকার আসিয়াছে, কোথায় কোন্ দোকানে নীলামে কাপড় বিক্রয় হইতেছে, কোথায় তসর ও গরদ শস্তায় পাওয়া যায়, সমস্ত সংবাদ সে চীৎকার করিয়া পড়ে, এবং রাত্রি বারোটা পর্যন্ত।

সকাল বেলাতেও নিস্তার নাই। নিজের স্কুলের পড়া, তারপর চিঠি আসিলে চিঠি পড়া। এবং এক এক লাইন পাঁচ বার ছয় বার করিয়া।

পল্লীগ্রামে তাহার বাড়ি, চিঠি হইতে বোঝা যায়।

দেশে বর্ষা কেমন হইল, ঘর মেরামত করিতে কত খরচ হইল, পিসিমা আসিয়া কয়দিন ছিল, সঙ্গে কতখানি গুড়

আনিয়াছিল, পিসিমার পুত্রকে ক'খানা কাপড় কিনিয়া দেওয়া হইয়াছে এই সব মূল্যবান সংবাদ পাড়ার লোককে শুনিতে হয়।

একদিন বৃষ্টি নামিল, এই ছেলেটি চীৎকার করিয়া পাড়ার লোককে বলিয়া দিল বৃষ্টি নামিয়াছে।

ছেলেটির মস্তিষ্ক যে বিকৃত এ বিষয়ে কাহারও কোনো সন্দেহ রহিল না। কিন্তু ইহাকে নিবৃত্ত করিবার উপায় কি ?

প্রতিবেশীদের সঙ্গে পরস্পর শব্দ লইয়া যে বিরক্তিজনিত গোপন মনোমালিন্য ছিল তাহা বিস্মৃত হইয়া সকলে একযোগে এই শব্দের প্রতিকার চিন্তা করিতে লাগিলাম। নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী শব্দ উৎপাদন করিবার অধিকার যে সকলেরই আছে, এবং থাকা উচিত, একথা কাহারও মনে হইল না। আমরা শুধু চিন্তা করিলাম, একমাত্র সে-ই তাহার অধিকার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে।

আমরা যে বাড়িতে থাকি তাহাতে চারিটি ফ্ল্যাট। আমাদের বাড়ির বিপরীত দিকের বাড়িতেও চারিটি ফ্ল্যাট— কিন্তু ভাড়াটিয়া পরিবার মাত্র দুইটি। দুইটিরই পরিচয় আমরা পাইয়াছি। একটি পরিবার রাত্রিতে ঝগড়া এবং মারামারি করে, আর একটির বিরুদ্ধে আমরা ষড়যন্ত্র করিতেছি।

একই লোকের বাড়ি। সুতরাং বাড়িওয়ালাকে আমরা সকলে মিলিয়া বলিলাম, আমরা এই চীৎকার আর সহ্য

করিতে পারিতেছি না, যদি প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে আমরা আগামী মাসে সকলে একযোগে এই বাড়ি হইতে উঠিয়া যাইব।

বাড়িওয়ালা বিপদ গণিলেন। সত্যই বিপদের কথা। সুতরাং তাঁহাকে কথা দিতে হইল নূতন ভাড়াটিয়াকে নোটিস্ দিবেন, আমাদিগকে আর উঠিয়া যাইতে হইবে না।

পরদিন বুঝিলাম বাড়িওয়ালা সত্যই নোটিস্ দিয়াছেন। কারণ নোটিস্খানাও ছেলেটি অভ্যস্ত রীতিতে চীৎকার করিয়া পাড়ার লোককে শুনাইয়া দিল।

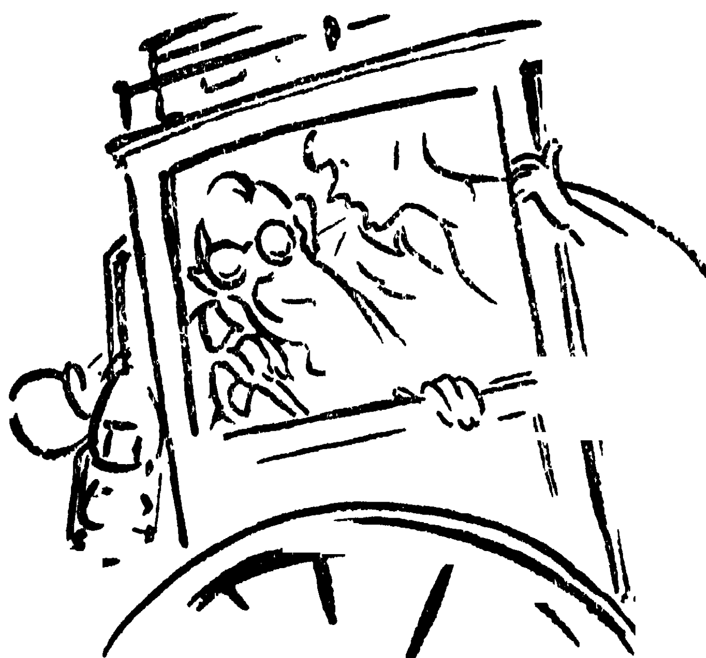
আরও প্রায় পনের দিন ছেলেটির অত্যাচার সহ্য করিলাম। তাহার পর তাহার উঠিয়া যাইবার দিন। সকালে একখানা ঘোড়াগাড়ি আসিয়া পৌঁছিল। গাড়িতে কি কি সম্পত্তি উঠিল তাহা দেখা গেল না, কিন্তু সবই শুনিতে পাইলাম।

গাড়ি বাঁক ঘুরিয়া আমাদের গলিতে পৌঁছিল। গৃহিণী রান্নাঘরে আবদ্ধ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার আর আমাদের বিজয়লাভের এই দৃশ্যটি দেখা হইল না।

গাড়ির দিকে চাহিলাম। কিন্তু তাহার পূর্বেই ছেলেটির চীৎকার আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

দেখিলাম গাড়িতে মাত্র দুইটি প্রাণী। একটি প্রায় আশী বৎসরের বৃদ্ধ আর সেই ছেলেটি। ছেলেটি বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ লইয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে—তাহার নূতন বাড়ির নম্বর। বৃদ্ধের চোখে আধ ইঞ্চি পুরু লেন্সের চশমা।

সহসা বুকে এক প্রবল ধাক্কা খাইয়া বসিয়া পড়িলাম। অর্ধঅন্ধ বধির বৃদ্ধটির মৃত্যুর মত কালো পটভূমিতে ছেলেটির এতদিনের চীৎকার—তাহার বালকজীবনের বেদনাময় আত্ম-ত্যাগের সমস্ত অর্থ লইয়া বিদ্যুতের মত ঝলকিত হইয়া উঠিল।



রৌদ্রোজ্জ্বল সকালটি আমার চোখে অন্ধকার হইয়া আসিল। এমন আত্মত্যাগী ছেলেটাকে মূঢ়তার নিষ্ঠুরতায় তাড়াইয়া দিলাম?···

গৃহিণী তাড়াতাড়ি আসিয়া বলিলেন, ওরা চলে গেল বুঝি?—তা হ'লে তোমাদেরই জিৎ হ'ল?

সংক্ষেপে শুধু বলিলাম, হ্যাঁ, জিতেছি।

(পরিচয়, ১৩৪৫)

দৈব ঘটনা

গোয়ালন্দঘাট স্টেশনে ঢাকা মেলে ভিড় দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িলাম। সংবাদপত্রের রিপোর্টার আমি, মফঃসল হইতে নানারূপ সংবাদ পাঠাইয়া একখানি কাগজ বিনামূল্যে পাই, কিন্তু অল্পদিন হইল মোহ কাটিয়া গিয়াছে। আর কাগজ নহে, টাকা চাই। সেই উদ্দেশ্যেই কলিকাতা যাইতেছি।

বসিবার জায়গার জন্য এ-গাড়ি সে-গাড়ি অনুসন্ধান করিতেছি ; কিন্তু কোথাও সুবিধা হয় না। আমাকে বারবার ঘোরাঘুরি করিতে দেখিয়া প্রথম শ্রেণীর রিজার্ভ কামরা হইতে এক নগ্নগাত্র সন্ন্যাসী আমাকে ডাকিয়া তাঁহার গাড়িতে আমাকে বসিতে দিলেন। পরিচয় লইয়া জানিলাম ইনি দেবাদিদেব মহাদেব, পার্বতীসহ কলিকাতা যাইতেছেন। হিমালয় হইতে ইঁহারা একেবারে সিলেট ঘুরিয়া গোয়ালন্দের পথে আসিয়া পড়িয়াছেন। আমার মনে সামান্য একটু সন্দেহ হইয়াছিল কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে ষাঁড় এবং সিংহকে দেখিয়া আর কোনো সন্দেহ রহিল না। দেব এবং দেবীকে সভক্তি প্রণাম করিলাম। ভক্তির মাত্রা বোধ করি একটু বেশিই হইয়াছিল, ভক্তির ঝোঁকে সিংহ এবং ষাঁড়ের দিকেও অগ্রসর হইলাম। কিন্তু আমার বাসনা পূর্ণ হইল না। সিংহ ঈষৎ

হাসিয়া পা সরাইয়া লইল এবং ষাঁড় এমন ভাবে শিং বাঁকাইয়া রহিল যে তাহার পা পর্যন্ত পৌঁছান আমার পক্ষে দুরূহ হইল, কাজেই ফিরিয়া আসিয়া দেবাদিদেবের পাশে বসিলাম।

দেখিলাম বাংলাদেশে বহুদিন হইতে ভ্রমণ করা অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও মহাদেবের আচার-ব্যবহার ধরণ-ধারণ সেকালের মতোই রহিয়া গিয়াছে। পূর্বেও হয় তো তাঁহাকে দেখিয়া থাকিব কিন্তু পরিচয় ছিল না, এইবার কাছে পাইয়া আলাপ জমাইবার চেষ্টা করিলাম। আমার পরিচয় দিলাম। মহাদেব প্রথমেই বলিলেন বাংলাদেশের লোকে আমাকে লইয়া নানারূপ ব্যঙ্গ করিয়া সংবাদপত্রে রিপোর্ট লিখিয়াছে, তুমিও হয় তো লিখিবে, কিন্তু তোমরা কি নূতন কিছু করিতে পার না? একজন যাহা করে তাহারই অনুকরণ তোমরা সকলে করিবে?

বুঝিলাম মহাদেব তাঁহার স্বভাবজাত ঔদাসীন্য ত্যাগ করিয়া আমাদের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাংলাদেশের দেবতারা যদি আমাদের প্রতি এইভাবে মনোযোগী হইয়া ওঠেন তাহা হইলে আমাদের দুঃখও হয় তো ঘুচিয়া যাইতে পারে। হয়তো মহাদেবের কৃপায় আমার একটি চাকুরী জুটিয়া যাওয়াও অসম্ভব নয়। মহাদেবকে দেখিলে সবারই মনে কেন যেন আপনা হইতেই কৌতুক জাগে। আমারও জাগিয়াছিল, কিন্তু এই কথাগুলি মনের মধ্যে হঠাৎ দীপ্ত হইয়া ওঠাতে আমার উদ্যত বিদ্রূপের অভিজাত ঔদ্ধত্য সংযম করিলাম এবং বিনয়ের মাত্রা একটু

অতিমাত্রাতেই চড়াইয়া দিয়া বলিলাম, দেবাদিদেব, আমি আমার রিপোর্টের খাতা সংবরণ করিলাম, কিছুই আমি লিখিব না, এমন কি অটোগ্রাফ চাহিয়াও আপনাকে বিরক্ত করিব না, কিন্তু দেব, একটি কথা শুধু আমার বলিবার ছিল।

এই কথাটি বলিয়া মহাদেবের দিকে চাহিয়া দেখি তাঁহার তিনটি নেত্রই উদাস ভাবে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে। গাড়ি তখন চলিতেছে, গাড়ির আলোয় রেল লাইনের পাশের পাটের ক্ষেতগুলি আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহার দৃষ্টি সেই দিকে নিবদ্ধ।

আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টি সেই দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না লক্ষ্য করিয়া পার্বতী সস্নেহে আমাকে বলিলেন, বল বাবা বল, তোমার যাহা বলিবার আছে বল, উঁহার দৃষ্টি বাহিরে গেলেও একটি কান কিন্তু তোমার দিকেই পাতিয়া রাখিয়াছেন।



আমার ভুল বুঝিতে পারিয়া বলিলাম, হে ত্রিকালজ্ঞ, আপনি একটি বিষয়ে আপানর নিজের প্রতি উদাসীন হইতেছেন।

পার্বতী পুনরায় বলিলেন, বেশি বাজে কথা না বলিয়া আসল কথাটা বল।

আমি আমার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য ক্ষমা চাহিয়া বলিতে লাগিলাম, আপনি ইহার প্রপাগাণ্ডার দিকটা মোটেই ভাবিতেছেন না। যদি আপনার সম্বন্ধে কোন বিদ্রূপাত্মক সংবাদও ছাপা হয় তাহা হইলেও আপনার অনেকখানি বিজ্ঞাপন প্রচার হয়। বাংলাদেশে আসিয়া বিনা বিজ্ঞাপনে অখ্যাতভাবে কোথাও থাকিয়া সুখ পাইবেন না। বাড়িওয়ালা বাড়িভাড়ার তাগাদায় অস্থির করিবে, মুদীর নগদ পয়সা ছাড়া এক কণা জিনিষও ধারে দিবে না এবং প্রতিদিন নগদ পয়সা জোটানের হাঙ্গামা আপনাকে সইতে হইবে। অথচ আপনি অনায়াসে এই সব বিপদ হইতে মুক্ত হইতে পারেন যদি আপনার সম্বন্ধে কিছু প্রপাগাণ্ডা হয়। এই প্রপাগাণ্ডা হইতে নিজেকে কেন বঞ্চিত করিতেছেন ?

মহাদেব এইবার একটিমাত্র চক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, বাধা আছে ছোকরা, বাধা আছে। সংসারের দায়িত্ব বোধ করি তোমার ঘাড়ে পড়ে নাই এবং সেই জন্যই এই রকম কথা বলিতেছ। জান, আমার ছেলেরা কলিকাতার হোটেলে থাকে এবং তাহারা আমার প্রাচীন চেহারার জন্য লজ্জিত ? জান, আমাকে লইয়া বিদ্রূপ করিলে তাহাদের প্রতিষ্ঠার হানি হয় ?

এ বিষয়ে কিছুই জানিতাম না, তাই বিনীতভাবে বলিলাম,

তাহারা কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত সে বিষয়ে আমি একেবারেই অজ্ঞ। অতএব আমার এই অজ্ঞতার অন্ধকারে একটু আলোকপাত করুন।

পার্বতী মহাদেবের দিকে চাহিলেন, আমিও চাহিলাম, দেখিলাম তাঁহার তিনটি চোখই ঈষৎ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ইহা দেখিয়া পার্বতী নিজেই আমার কথার উত্তরে বলিলেন, ছেলেদের কথায় উনি বড়ই দুঃখ পান। তারা এরূপ দুর্বিনীত হইয়া উঠিয়াছে যে কলিকাতার প্রকাশ্য থিয়েটারে তারা দক্ষযজ্ঞ অভিনয় করিতেছে এবং কার্তিক তো স্বয়ং দেবাদিদেবের ভূমিকাতেই নামিতেছে। পুত্র হইয়া পিতার চরিত্র অভিনয় করা এ কি সহ্য করা যায়?

আমি বলিলাম, বিংশ শতাব্দীর ছেলেদের মনে কোন সংস্কার নাই। সুতরাং সেজন্য বৃথা দুঃখ করিয়া লাভ কি?

শিব এ কথায় হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন; হ্যাঁ তা জানি, কিন্তু সংস্কার তোমাদের যে শুধু মনে নাই তাই নয়, সংস্কার তোমাদের কোথায়ও নাই। কলিকাতা শহরের সর্বত্র ঘুরিয়া দেখিয়াছি পথে পথে রাশীকৃত আবর্জনা। অন্তরে বাহিরে তোমাদের সংস্কারের অভাব। অন্তরের সংস্কারহীনতার দায়িত্ব তোমরা চাপাইতেছ বিংশ শতাব্দীর উপর আর বাহিরটা চাপাইতেছে কর্পোরেশনের উপর। অভাব দেখিতেছি শুধু—কিসের অভাব পার্বতী বলিয়া দাও তো, তোমাদের ঐ যন্ত্রটির নাম আমি আবার বার বার ভুলিয়া যাই।

পার্বতী কিঞ্চিৎ হাসিয়া বলিলেন, সম্মার্জনীর।

দেবাদিদেব বলিলেন, হ্যাঁ ঐ সম্মার্জনীর অভাব। কিন্তু এ বিষয়ে আমি নিরুপায়। ছেলেদের খাতিরে আমাকেও বিংশ শতাব্দীর দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। ছেলেরা পিতার জন্য অপমান বোধ করে, এইখানে আমি হার মানিয়াছি।

আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মহাদেবের দিকে চাহিলাম।

পার্বতী বলিলেন, তা বুঝি জান না? উনি আধুনিক হইবার চেষ্টায় বাড়ি বসিয়া তোমাদের বিজ্ঞান লইয়া গবেষণা করিতেছেন। হিমালয়ে একটি ল্যাবরেটরিও স্থাপন করিয়াছেন। সেখানে কেমেস্ট্রি ফিজিক্স, অ্যাস্ট্রনমি প্রভৃতি লইয়া গবেষণা করিতেছেন। গৌরীশঙ্করের মাথায় একটি দূরবীণও বসান হইয়াছে।

কথাটা শুনিয়া আমি এরূপ কৌতুক অনুভব করিলাম যে, বেয়াদপি হওয়া সত্ত্বেও, দেবাদিবের মুখের উপর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

মহাদেব একটি চোখ আমার দিকে ফিরাইয়া অসঙ্গত হাসির কৈফিয়ৎ তলব করিয়া বসিলেন। বুঝিলাম পুনরায় অন্যায় করিয়াছি।

ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু দেব ছাড়িলেন না, হাসিবার কারণ বলিতেই হইল। বলিলাম, গৌরী এবং শঙ্কর তো আপনারাই, এবং আপনারা উভয়েই দূরদৃষ্টির জন্যই বিখ্যাত। কাজেই দূরে দৃষ্টিপাত করিবার জন্য

আপনাদের শিরোদেশে দূরবীক্ষণ স্থাপনের কিছু আবশ্যকতা আছে কি ?

মহাদেব অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া বলিলেন, তাই বল। কিন্তু ঐ সব না করিলে তোমাদের বিংশ শতাব্দীতে কল্‌কে পাইব কেন ?

আমি বলিলাম, আপনারা প্রধানতঃ বাংলা দেশেই আসিয়া থাকেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় বাংলা দেশের উপর বিংশ শতাব্দীর প্রভাব কিছুই লক্ষ্য করেন নাই।

শঙ্কর বলিলেন, না করিনি।

আমি বলিলাম, শুধু তাই নয়, বাংলা দেশও বিংশ শতাব্দীর উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।

শঙ্কর আরও বিস্মিত হইয়া বলিলেন অস্যার্থঃ ?

আমি বলিলাম, এ দেশের গতির সঙ্গে যদি তাল রাখিয়া চলিতে চান তাহা হইলে আধুনিক কবিতা



নামক আমরা যে জিনিসটি সৃষ্টি করিয়াছি তাহাতে আপনার কিঞ্চিন্মাত্র অধিকার হইলেই চলিবে। আধুনিক হইবার জন্য আপনি যে সব প্ল্যান করিয়াছেন তাহা বাংলা দেশের পক্ষে

সম্পূর্ণ অনাবশ্যক, ঐ সব প্ল্যান লইয়া আপনি বাংলায় না আসিয়া বাঙ্গালোরে গেলে ভাল করিতেন। বাংলা দেশে আধুনিক কবিতাই যথেষ্ট। উদ্দেশ্য সিদ্ধির এই সহজ পন্থাটা আপনার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

সিদ্ধির কথা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মহাদেবের চক্ষুস্ত্রয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি জোর গলায় সিদ্ধিদাতাকে ডাকিতে লাগিলেন। ভাবিলাম গণপতিকে ডাকিতেছেন। কিন্তু আমার অনুমান মিথ্যা প্রমাণ করিয়া ভৃত্যের কামরা হইতে নন্দী একতাল বাঁটা সিদ্ধি লইয়া উপস্থিত হইল এবং তাহা নীলকণ্ঠের হাতে দিল। তিনি সেটুকু গলাধঃকরণ করিয়া মিনিটখানেক পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে বাহিরে চাহিয়া রহিলেন। তারপর নীলকণ্ঠ স্থিরকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, আধুনিক কবিতা কি তাহা বুঝাইয়া দাও, ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনে বেশ একটা কাব্যের 'মুড' আসিয়াছে।

আমি সুযোগ বুঝিয়া রিপোর্টের খাতা বাহির করিলাম। আমি তাহাতেই কবিতা লিখি। আমার এই পরিচয় পূর্বে অনাবশ্যক বোধেই দেই নাই।

এই কবিতা পড়িতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু মাত্র চার পাঁচ লাইন পড়িয়াছি এমন সময় চন্দ্রচূড় হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, আমার সঙ্গে ইয়াকি করিও না, করিলে হয় তো তোমারই অনিষ্ট হইবে। আমার মাথায় খুন চাপিয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

আমি হতাশ হইয়া পড়িলাম। সমস্ত উৎসাহ নিবিয়া গেল। অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ করিতে গেলাম কেন? ভাবিতে ভাবিতে আমার চোখে জল আসিল। খাতাখানা চোখের সম্মুখে খোলা রহিয়াছে—তাহারই দিকে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলাম। কবিতার লাইনগুলি চোখের জলে সিক্ত হইতে লাগিল। আবার কবিতাটি পড়িলাম ঃ—

বেগুনী আকাশ	বসরার গোলাপ
পেনগুইন পাখী	রাঙা সন্ধ্যা
ছোট	নরম
ডানাহীন	তুলতুলে
ঠিক যেন	ঘাসের বিছানা
আরবের মরুভূমিতে	শ্যাম বেরাল।
উট	একটি
ঈজিপ্টের	দুইটি
ওয়েসিস	পাঁচটি
আর পিরামিড	ইরান, অ্যাবিসীনিয়া,
ঈষাণ	ডোব্রুজা, জিবুটি—
বিষাণ	টপ্‌টপ্ বৃষ্টির ফোঁটা
কালকূট।	—কাবুলি বেদানা।

এই কবিতা মহাদেবকে টলাইতে পারিল না।

আমার দুঃখ দেখিয়া পার্বতীর মাতৃহৃদয় বোধ করি দ্রবীভূত হইল, তিনি গোটাকতক কলা আমাকে খাইতে দিলেন এবং বলিলেন, গণপতির জন্য এককাঁদি লইয়া যাইতেছি, কিন্তু

তোমার মন যেরূপ বিচলিত হইয়াছে তুমিও দুটি খাও আরাম পাইবে।

বিনা দ্বিধায় দেবীপ্রদত্ত দুইটি কলা উদরস্থ করিবার পর সত্যই মনটা বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল। ভাবিলাম, ইঁহাদিগকে আর বিরক্ত করিব না, করিলে হয় তো একটা কিছু প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া কাব্যে যাঁহার প্রাণে সাড়া জাগায় না তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই, তাই সোজাসুজি কাজের কথা পাড়িলাম। বলিলাম, হে ত্রিশূলী, আমার অনিষ্ট করিবার জন্য এই ট্রেনে আপনি শৈব শক্তির কোনও মহিমা ফুটাইয়া তুলিবেন সে জন্য আমি প্রস্তুত হইয়া আসি নাই। আমার শুধু প্রার্থনা—আপনার দৈবশক্তি যদি কিছু থাকে তবে তাহাই আমার উপর প্রয়োগ করুন।

এ কথায় উত্তর দিলেন শুম্ভনিশুম্ভঘাতিনী। তিনি বলিলেন, দেবাদিদেব তো কাহাকেও মাতুলী দেন না।

আমি বলিলাম, আমি মাদুলী চাই না একটি চাকুরি চাই। এবং এই চাকুরি দৈবশক্তি ভিন্ন অন্য কোনও শক্তিতে লাভ হয় না। বাংলার সমস্ত জৈবশক্তি এখন ইহারই দিকে তাকাইয়া আছে।

আমার কথা শুনিয়া মহাদেব আমার আরও কাছে সরিয়া বসিলেন এবং আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিলেন, আমাকে কি দিবে?

এই প্রশ্ন শুনিয়া আমি সত্যই বিস্মিত হইলাম। বিস্ময়টা

আনন্দমিশ্রিত। মন হইতে সকল নৈরাশ্য এক মুহূর্তে দূর হইয়া গেল। ঘুস দিয়া কার্যোদ্ধারের জন্য নহে, দেবাদিদেব মহাদেবকে সম্পূর্ণ বাঙালী হইতে দেখিয়া। আর আমার কোনও ভয় নাই। এতক্ষণ পরে বাঙালী দেবতার হাতে আসিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইলাম। আমি বলিলাম, আপনি যাহা চান তাহাই আপনাকে দিব।

মহাদেব বলিলেন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।

আমিও তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলাম।

চন্দ্রশেখর আমার দিকে ভালভাবে ঘুরিয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন, কথাটা যখন উঠিল তখন আমার সমস্ত প্ল্যানটাই তোমাকে বলি। আমি এবারে কলিকাতায় যাইতেছি একটি বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া। কিন্তু তার আগে মাত্র একটি প্রশ্ন তোমাকে করিব। আমার যে পোষাক দেখিতেছ তাহাতে আমি কোন্ কাজের উপযুক্ত বলিয়া তোমার মনে হয়?

সসঙ্কোচে বলিলাম, ষাঁড়টিকে যদি বেকার না রাখিতে চাহেন তাহা হইলে বোধ হয় আপনার পক্ষে কৃষিকার্যই উত্তম।

ত্রিশূলী বলিলেন, মোটেই তাহা নহে। আমি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হইতে চাই। হইলে তোমাকে আমি সেক্রেটারি করিব। কিন্তু তৎপূর্বে তোমার ঐ তিন ইঞ্চি জুলফি কামাইয়া ফেলিতে হইবে!

এই অপ্রত্যাশিত কথাটিতে বিস্ময় বোধ করিলাম। কিন্তু সহসা বুদ্ধিও আমার খুলিয়া গেল। বলিলাম, জুলফি রাখিব

না। কিন্তু আপনি প্রেসিডেণ্ট হইলেও বছর খানেকের জন্য হইবেন, তাহার পর আমি কি করিব?

দেবতা ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন। বলিলেন, বর্তমানকে ছাড়িয়া তোমাদের দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে একটুও অগ্রসর হইতে পারে না, কিন্তু আমি ক্ষণকাল ধ্যানস্থ হইয়াই বুঝিতে পারিয়াছি—আমি অন্ততঃ আগামী আড়াই হাজার বৎসরের জন্য প্রেসিডেণ্টের পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিব।

কথাটায় হাসি পাইল কিন্তু হাসি সংবরণ করিলাম। বুঝিলাম দেবতা সিদ্ধির প্রভাব হইতে এখনও মুক্ত হইতে পারেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম কেমন করিয়া তাহা সম্ভব হইবে? আপনি জানেন যুদ্ধের পরেই ভারতবর্ষের ডমিনিয়ন স্টেটাস্ পাইবার সম্ভবনা আছে। তাহা যদি হয় তাহা হইলে তখন সম্রাটের প্রতিনিধি হইবেন রাষ্ট্রপতি, কংগ্রেসের লোক হইয়া আপনি কি করিবেন? তাহা ছাড়া হয় তো কংগ্রেসও তখন ডমিনিয়ন ষ্টেটাস মানিয়া লইবে, তাহা হইলেই বা পৃথক রাষ্ট্রপতি থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? তবে যদি ডমিনিয়ন স্টেটাস হইতে কংগ্রেস সরিয়া থাকে তাহা হইলে হয় তো থাকিতে পারে। কিন্তু তখন দেশের সকল লোক ডমিনিয়ন স্টেটাসের ভক্ত হইয়াছে—কংগ্রেস সে অবস্থায় জনপ্রিয় হইবে কি করিয়া? এই সব প্রশ্নের উত্তর দিন।

মহাদেব বলিলেন, তোমাকে কথা বলিবার সুযোগ দিয়া অন্যায় করিয়াছি। সুতরাং তুমি একটু থাম, অমি ভবিষ্যৎটা

কি ভাবে দেখিয়াছি তাহা তোমাকে জানাইতেছি। তুমি জান কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং বড়লাটের মধ্যে বহুবার সাক্ষাৎকার এবং বহু পত্র-বিনিময় ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে? একটি বিষয়ে আসিয়া সব আটকাইয়া যাইতেছে। বড়লাটের কাউন্সিলে কংগ্রেস ঢুকিবে কি না তাহা ঐ বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে। বড়লাট যদি কংগ্রেসের একটি দাবী মানিয়া লন, তাহা হইলে কংগ্রেস বড়লাটের কাউন্সিলে ঢুকিতে পারে।

প্রত্যেকটি সাক্ষাতের পূর্বে বহু তোড়-জোড় হয়, সাক্ষাতের বন্দোবস্ত হয়, কিন্তু ঐ জায়গায় আসিয়া সব পণ্ড হইয়া যায়। উভয় পক্ষের মধ্যে যতবার সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে ততবারই ইহা হইয়াছে। এবং আরও বহুকাল এইরূপ ঘটিবে। বহুকাল মানে আরও আড়াই হাজার বৎসর। আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি ভারতবর্ষ ডমিনিয়ন স্টেটাস পাইয়াছে কিন্তু কংগ্রেস তাহার মধ্যে নাই। বড়লাটের সঙ্গে পূর্বের মতোই সাক্ষাৎ হইয়াছিল, কিন্তু একটি বিষয়ে মতভেদ থাকাতে কংগ্রেস নূতন গভর্নমেণ্টে যোগ দিতে পারে নাই।

বহুযুগ কাটিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে বড়লাটের আলোচনা তখনও চলিতেছে। কি করিয়া তাহা সম্ভব তাহা বলিতেছি। ভারত গবর্নমেণ্ট এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্টের মধ্যে একটি মত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, কংগ্রেস যতদিন না ঐ দুর্লঙ্ঘ্য

বিষয়টি সম্বন্ধে কোনো মীমাংসা করিবে ততদিন কংগ্রেসের প্রয়োজন না থাকিলেও কংগ্রেস থাকিবে এবং বড়লাটের পৃথক একটি পদও থাকিবে। সুতরাং কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্টও থাকিবেন, এবং পূর্ণস্বাধীন ভারতবর্ষে বড়লাটের পদ না থাকিলেও বড়লাট থাকিবেন।

১৯৯০ সালে কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট এবং বড়লাটের মধ্যে পত্রবিনিময় চলিতেছে—কিন্তু মীমাংসা হইতেছে না।

২৫০০ খৃষ্টাব্দে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট এবং বড়লাটের মধ্যে আলোচনা চলিতেছে। কংগ্রেস প্রায় রাজি হইয়াছিল কিন্তু একটি বিষয়ে উভয়ের মতভেদ হইয়াছে।

৩০০০ খৃষ্টাব্দেরও ঐ একই সংবাদ। ভারতবর্ষের চেহারা সম্পূর্ণ অন্যরকম হইয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসেরও পরিবর্তন হইয়াছে। সমস্ত পৃথিবী হইতে যুদ্ধ থামিয়া গিয়াছে। কেহ কাহারও উপর আক্রমণ চালাইতেছে না—কোনো দেশের সঙ্গে কোনো দেশের শত্রুতা নাই।

৪০০০ সালে সকল দিক দিয়াই পৃথিবীর রূপ বদলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তবু ভারতবর্ষের এক নিভৃত অঞ্চলে কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট এবং বড়লাট বাস করিতেছেন। তাঁহারা এখন আর পৃথক জায়গায় থাকিয়া মাঝে মাঝে দেখা করেন না। একই বাড়িতে থাকেন এবং প্রতিদিন আলোচনা করেন। সকাল হইতে আলোচনা বেশ জমিয়া উঠে। মত প্রায় মিলিয়া যায় কিন্তু সন্ধ্যার দিকে একটি বিষয়ে উভয়ের মতভেদ ঘটে

এবং রাত্রে খাওয়াদাওয়ার পরে আলোচনা এমন আটকাইয়া যায় যে আর একটি কথাও বলা চলে না। তখন উভয়েই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে নিজ নিজ বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়েন।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর প্রথম কয়েক বৎসরের মধ্যেই কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হইবার আগ্রহ কংগ্রেসী লোকের কমিয়া গিয়াছে। কাজেই আমাকেই সেই পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। অমানুষিক দুঃখ সহ্য করিবার ক্ষমতা সাধারণ লোকের থাকিতে পারে না, এবং সামান্য বেতনে কাজ করিবার ক্ষমতা অসাধারণ লোকের থাকিতে পারে না, কিন্তু আমার দুটি ক্ষমতাই আছে, তুমি জান আমি নীলকণ্ঠ। সুতরাং এই দুঃখ সহ্য করিয়া কংগ্রেসকে আগামী আড়াই হাজার বৎসর বাঁচাইয়া রাখা আমি ভিন্ন কাহারও সাধ্য নাই। আমার যে বাঘছালের পোষাক দেখিতেছ ইহাতে আমার আধুনিক যুগের পুত্রেরা লজ্জিত হইতে পারে কিন্তু কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের পক্ষে এই পোষাক আদৌ লজ্জাকর নহে।

এই কথাগুলি মহাদেব একটা অপার্থিব দৃষ্টি লইয়া অত্যন্ত আবেগভরে আমাকে শুনাইলেন। শুনিয়া অবিশ্বাস করিতে পারিলাম না, এবং আমাকে তাঁহার সেক্রেটারির পদটি দিয়া আমারই বেতনের অংশ ঘুস চাহিতেছেন কেন তাহাও বুঝিতে পারিলাম।

শিব অর্ধধ্যানের অবস্থায় ছিলেন, সেই জন্য বোধ হয়

আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা প্রেসিডেন্টের। তুমি জান পদটি অবৈতনিক, কিন্তু সেক্রেটারির পদ অবৈতনিক নহে। ভারত গভর্নমেন্ট হইতে তোমাকে বেতন দেওয়া হইবে। আমারই সম্মুখে আমারই হাত দিয়া তুমি তাহা লইয়া স্ফূর্তিতে দিন কাটাইবে আর আমি সপরিবারে অনাহারে অর্ধাহারে কাটাইব?

আমি বলিলাম, কিন্তু এইটেই তো আপনার ট্রাডিশন! আপনি পার্থিব ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন বলিয়াই লোকে আপনাকে শ্রদ্ধা করে।

মহাদেব আমার কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার চক্ষুস্ত্রয় পুনরায় রক্তবর্ণ ধারণ করিল। এমন মনে হইল যেন আমাকে খুন করিয়া ফেলিলে সন্তুষ্ট হন। তাহা দেখিয়া পার্শ্বস্থ অর্ধনিদ্রিত ষাঁড়টি উঠিয়া আমাকে ভীষণ জোরে একটি গুঁতা মারিয়া আসন হইতে আমাকে নীচে ফেলিয়া দিল। ষাঁড় আমাকে দেখিয়া শিং বাঁকাইয়া ছিল কেন এত-



ক্ষণে বুঝিলাম। পার্বতী কিন্তু ইহাতে মহাদেবের উপর খুব চটিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন, তুমি ইহাকে কত বেতন দিবে তাহা আগে না জানাইয়া অংশ দাবী করিয়াছ, এ তোমার

কি রকম আক্কেল? দিন দিন তোমার মাথা খারাপ হইয়া যাইতেছে।

এইভাবে দেবীর কণ্ঠস্বর চড়িতে চড়িতে ক্রমে তারার সপ্তকে পৌঁছিল। সঙ্গে সঙ্গে আসনের নীচে হইতে দেবীর সিংহটি বাহির হইয়া আসিয়া ষাঁড়ের মুখে ভীষণ এক থাবা মারিয়া নীরবে পুনরায় স্বস্থানে গিয়া শুইয়া পড়িল।

মহাদেব ইহা দেখিয়া ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন। সিংহ আসিয়া ষাঁড়কে অপমান করিয়া গেল! এবং এই অপমান সে আজ নূতন করে নাই। কিছুদিন হইতেই সিংহ বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। মহাদেব আর সহ্য করিবেন না, এখনই ইহার প্রতিকার করিবেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠস্থল বেগুনী হইয়া উঠিল। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন:—



আমি আমার অপমান সহ্য করিলেও ষাঁড়ের অপমান সহ্য করিব না।

মহাদেবের গর্জনে গাড়ি ভয়ানক কাঁপিতে লাগিল। মনে হইল যেন এখনই প্রলয় নামিয়া আসিবে। আমিও কাঁপিতে লাগিলাম। আমারই জন্য দেবতাদের মধ্যে কলহ, আমার কি

দুর্দশা হইবে তাহা অনুমান করিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম, তাহারই মধ্যে মহাদেবের তাণ্ডব নৃত্যের কয়েকটা ফিগার যেন আমার চোখে মাঝে মাঝে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কি শব্দ সেই নৃত্যের। মনে হইতে লাগিল কানের কাছে যেন সহস্র বিস্ফোরক বোমা ফাটিতেছে। সে শব্দ আকাশে না ট্রেনের মধ্যে বোঝা আমার পক্ষে অসাধ্য ছিল। মনে হইল সেই মুহূর্তে সব শেষ হইয়া যাইবে,—সব ধ্বংস হইয়া যাইবে, এবং ঠিক এই মুহূর্তেই আকাশ বিদীর্ণ করিয়া গাড়ির উপর প্রচণ্ড গর্জনে বজ্রপাত হইল, গাড়ি লাইন ছাড়িয়া নীচে পড়িয়া গেল। তাহার পর কি হইল মনে নাই।

সাত দিন পরে জ্ঞান লাভ করিয়া শুনিতে পাইলাম ঢাকা মেল দুর্ঘটনায় বহু লোক হতাহত হইয়াছে। আরও শোনা গেল, রিজার্ভ প্রথম শ্রেণীর সন্ন্যাসী-পরিবার নিখোঁজ হইয়াছেন—সিংহ এবং ষাঁড়টিকেও পাওয়া যায় নাই, শুধু তাহাদের গলার লেবেল দুইটি পড়িয়া আছে!

(বঙ্গশ্রী, ১৩৪৭)

কম্বল ও পানু

পানু দত্ত এবং অভয় দে কলেজের থার্ড ইয়ার হইতে ফোর্থ ইয়ার পর্যন্ত সহপাঠী এবং কলেজের বাহিরে প্রথম বর্ষের প্রথম দিকেই ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কলেজে পড়িবার সময় ইহারা দুই জনে অবশ্য-পাঠ্যের সীমানার বাহিরে অনাবশ্যক পাঠ্যের ভিতর দিয়া উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করিয়াছিল। এমন দেখা যাইত, ক্লাসে দর্শনের অধ্যাপক এথিক্‌সের মর্মকথা প্রাণপণে বুঝাইতেছেন, ছাত্রেরা মনোযোগ দিয়া অথবা মনোযোগের ভান করিয়া সেই বক্তৃতার দিকে লক্ষ্য করিতেছে, কিন্তু পানু পিছনের একটি আসনে বসিয়া আমেরিকা হইতে সদ্যপ্রকাশিত তদ্দেশীয় একখানি শিল্প-সংক্রান্ত বই গভীর মনোযোগের সহিত পড়িতেছে। আরও বিস্ময়ের বিষয় এই যে, অভয়ও ঠিক সেই সময় পিছনের আর একটি আসনে বসিয়া জাপান হইতে প্রকাশিত আর একখানি শিল্প-সংক্রান্ত বইতে মনোনিবেশ করিয়াছে।

পরস্পর অপরিচিত হইলেও ক্রমশ শিল্পের অদৃশ্য আকর্ষণে উভয়ে উভয়ের নিকটে আসিয়া পড়িল এবং অল্প দিনের মধ্যেই অত্যন্ত পরিচিত হইয়া উঠিল। আলাপ ঘনিষ্ঠ হইলে দেখা গেল অভয় বিত্তশালী, কিন্তু পানুর বিত্ত নাই আছে শুধু চিত্ত। এবং শুধু এই কারণেই সে এত চিত্তাকর্ষক যে তাহার সঙ্গে আলাপ

করিতে বসিলে সহজে তাহা ছাড়িয়া ওঠা যায় না, তদুপরি বুদ্ধিও তাহার ক্ষুরধার।

সুতরাং আকর্ষণ দুই জনের মধ্যেই প্রবলভাবে কাজ করিল, এবং এই 'মধ্যাকর্ষণে'র ফলে উভয়েই মধ্যপথে কলেজ ছাড়িয়া সোজা টালিগঞ্জের দিকে একটি প্রকাণ্ড শেড্ ভাড়া লইয়া তাহার মধ্যে গিয়া উঠিল।

পান্নুর পরামর্শে এবং অভয়ের টাকায় সেই শেডের মধ্যে কম্বল তৈয়ারির প্ল্যান চলিতে লাগিল।

পাঠক, কম্বলের কথায় ঘামিয়া উঠিবেন না। শুধু ইতিহাসটা শুনুন।

এই কম্বল প্রথমে আসে পান্নু দত্তের মাথায়। কম্বল সম্বন্ধে তাহার এই দুর্বলতা কোথা হইতে আসিল তাহা সে নিজেও ভাল করিয়া জানে না। কিন্তু কিছুদিন হইতেই তাহার কেমন একটা ধারণা হইয়াছে যে মুক্ত ক্ষেত্রে বাঙালীকে কম্বল প্রস্তুত করিতে হইবে, শুধু জেলে গিয়া প্রস্তুত করিলেই চলিবে না। কারণ জেলের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে কম্বলের উৎপাদন-পরিমাণ অত্যন্ত কম, কাজেই বাঙালী চিরদিনই এই কম্বলের জন্য অন্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকে। কোনও দিন যদি বাংলা প্রদেশ স্বতন্ত্র দেশে পরিণত হয় তাহা হইলে একমাত্র কম্বলের জন্যই হয়তো তাহার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে হইবে।

অভয় দে কিন্তু কম্বল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। সে শুধু জানে

দোকানে দোকানে যাহা "র‍্যাগ" নামে পরিচিত এবং যাহার সাইনবোর্ড দেখিলে শিক্ষিত বাঙালীর মাথায় অযথা রাগ চড়িয়া যায় তাহাই কম্বল এবং তাহার মূল্য তিন-চারি টাকা হইতে ত্রিশ-চল্লিশ টাকা। ইহা কি বাঙালী প্রস্তুত করিতে পারিবে? পানু বলিল, নিশ্চয় পারিবে। আমরাই পারিব। অভয় দে এক লক্ষ টাকা বাহির করিয়া দিল, এবং দিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিল।

পানু দত্তের সঙ্গে অবশ্য তাহার একটা বোঝাপড়া হইল। অভয় দে জানিত পানু ছাড়া তাহার এ কারবার চলিতে পারে না। সে শুধু টাকাই দিতে পারে কিন্তু ব্যবসাতে সূক্ষ্ম বুদ্ধির যে খেলা দেখাইতে হয় তাহা তাহার মধ্যে নাই। কাজেই অভয় দে পানুকে বলিল, আমাদের এই ব্যবসায়িক সংযোগ যাতে স্থায়ী হয়, মাঝখানে কোনো রকম গোলমাল না হয় সেদিকটাও ভাবা দবকার।

পানু বলিল, তোমার প্রাণ এবং আমার মান রইল এর মধ্যে, আমি ছেড়ে গেলে তোমার কি ক্ষতি হবে তা কি আমি বুঝি না? কিন্তু এইটেই তো সব নয়, তোমাকে ছাড়লে আমার কি হবে সেইটেই বেশি ক'রে ভাবছি।

অভয় দে বুঝিল পানু ঠিকই বলিয়াছে, কিন্তু তবু একটা লেখাপড়া থাকা ভাল। পানুর টাকার অংশ না থাকিলেও তুই জনের কাজের অংশের সর্ত একটা নির্দিষ্ট হওয়া দরকার এবং সেটা পাকাপাকিভাবে দলিলভুক্ত থাকা চাই।

অভয় দে চট্ করিয়া সেই মুহূর্তে কথাটা বলিতে পারিল না, আর এক দিন বলিল।

পানু অবাক হইল। সে বলিল, কারবারটা সম্পূর্ণ তোমার, আমি একটি উপলক্ষ মাত্র, কাজেই লেখাপড়ার মধ্যে দিয়ে আমার একটা অধিকার এতে স্থাপন করা আমার পক্ষে লজ্জাকর। তুমি কি আমাকে ফাঁকি দেবে? আমি কি এমন কল্পনা স্বপ্নেও করতে পারি? কাজেই ও সব কথা আর তুলো না। তোমাকে আমি চিনি, তোমার মুখের কথাই আমার পক্ষে দলিলের চেয়ে বেশি।

অভয় দে বলিল, তা হ'লে এস আমরা সেকালের মতো মুখের কথায় শপথ ক'রেই শুভ কাজ আরম্ভ করি।

পানু খুব উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, ভদ্রলোকের পক্ষে মুখের কথার চেয়ে দামী জিনিস সংসারে আর কি আছে? আমরা শপথ করছি, এই কম্বলকলের আমরা তুজন অংশীদার। আমরা যদি লাভ করি তা হ'লে আমরা তুজনে সমান লাভবান হব, আমরা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হই তা হ'লে সে ক্ষতি আমাদের তুজনেরই হবে। তখন আমি একটি পয়সা না নিয়ে এই কারবার চালাতে থাকব।—এক কথায় আজ থেকে আমরা একসঙ্গে ভাসছি, ডুবি তো একসঙ্গেই ডুবব।

অভয় দে নির্ভয় হইল। পানুর উপর বিশ্বাস তাহার আরও বাড়িয়া গেল, শ্রদ্ধাও বাড়িল অনেক।

পানু কিছু দিন হইতে অভয় দেকে অভয়-দা বলিয়া

ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আজ অভয় দেব সত্যই মনে হইল পানু তাহার ছোট ভাই।

পানুর কম্বল-উৎপাদনের উৎসাহ অসম্ভব রকম বাড়িয়া গেল। সেই উৎসাহ কম্বলকে ছাড়াইয়া গেল। উৎসাহের সঙ্গে প্রচার বাড়িল দশ গুণ। পানু কম্বলের বার্তা বাংলা দেশের গৃহে গৃহে প্রচার করিল। সে বলিল, বাঙালীকে বাঁচতে হ'লে কম্বল চাই।

কেহ কেহ অবশ্য বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল, শুধু কম্বল নয় ঐ সঙ্গে লোটাও। কিন্তু পানু সে-কথায় কান দেয় নাই। পানুর শত্রু হইতে মিত্রের সংখ্যাই ক্রমশ বাড়িয়া চলিল এবং তাহারা সবাই বলিতে লাগিল, কানু ছাড়া যেমন গীত নাই, পানু ছাড়া তেমনি কম্বল নাই।

পানু শুধু যে কম্বল সম্বন্ধেই প্রচার করিতে লাগিল তাহা নহে, অভয়-দা সম্বন্ধেও প্রচার চালাইতে লাগিল। পানুর ভাষায় বর্তমান বঙ্গে অভয়-দা'র মতো দেশপ্রেমিক ত্যাগী লোক দ্বিতীয় নাই। যে দেশের ইতিহাসে কম্বল নাই সেই দেশে অভয়-দা কম্বলের কল স্থাপন করিয়া বাঙালীকে হীনতার হাত হইতে বাঁচাইয়া দিলেন। বাংলা দেশের শিল্পের ইতিহাসে অভয়-দা অবিস্মরণীয় উপকরণ যোগাইবার ভার গ্রহণ কবিয়াছেন।

পথে ঘাটে অভয়-দা'র নাম প্রচারিত হইল, বাংলা দেশের প্রত্যেকটি লোক অভয়-দা'র নাম জানিল।

অভয় দে অল্পকালের মধ্যেই স্থায়ী ভাবে 'অভয়-দা'তে পরিণত হইল। এবং সে অভয় চক্রবর্তী, না অভয় সরকার, না অভয় সেন, তাহা ভাল করিয়া জানিবার পূর্বেই তাহাকে অভয়-দা হিসাবে জানিয়াই সকলে পরম তৃপ্ত হইল।



পানু বক্তৃতা দিতেছে···

অভয় পথে বাহির হইলে লোকে সবিস্ময়ে বাংলা দেশের এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিটির দিকে চাহিয়া থাকে, আর অভয় আনন্দে গর্বে ফুলিয়া ওঠে। পানুই তাহাকে বাংলা দেশে এই প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করিয়াছে এ-কথা মনে আসিতেই পানুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তাহার মন ভরিয়া যায়।

পানুর শুদ্ধ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ ছিল, ব্যবসায়ক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিয়া দেখা গেল সেদিকেও তাহা সমান তীক্ষ্ণ!

পানু অভয়-দা'কে বুঝাইল, ব্যবসার বহু পূর্ব হইতেই প্রচার করা আবশ্যক। এমন কি ব্যবসার পরিকল্পনা-সময়

হইতেই প্রচার আরম্ভ করিতে হয়। অনুর্বর দেশে উপযুক্ত সার দিয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত না করিলে কোনো ফসলই ফলে না। প্রচার এই সার। এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়া চলিতে চলিতে পান্নু বুঝিতে পারিল এবং অভয়ও বুঝিল প্রচার সার বটে, কিন্তু উপযুক্ত বুদ্ধি না খাটাইতে পারিলে শেষে প্রচারই সার হইয়া দাঁড়ায়, আর কোনো কাজ হয় না। এজন্য পান্নু দেশের বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের মতামত সংগ্রহ করিল। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগ সবাই পান্নুকে উৎসাহপত্র পাঠাইল।

কম্বল সম্বন্ধে কংগ্রেস বলিল—জীবকে হত্যা না করিয়াও কম্বলের জন্য প্রয়োজনীয় লোম সংগ্রহ করা যায় বলিয়া কম্বল অহিংসার একটি প্রতীক। কম্বলের সূতা চরকায় কাটা যায় বলিয়া এবং কম্বল তাঁতে বোনা যায় বলিয়া ইহাতে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে। কম্বল খদ্দর হইতে উৎকৃষ্ট।

কম্বল সম্বন্ধে হিন্দু মহাসভার মত--গোরুর লোম হইতে প্রস্তুত নহে বলিয়া আমরা বরাবরই কম্বলের ভক্ত। উপরন্তু ইহা হিন্দু সন্ন্যাসীর অবলম্বন বলিয়া দেশে কম্বল-প্রচারে আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। তবে দেখিতে হইবে লোম যদি বিদেশ হইতে আমদানি করিতে হয় তাহা হইলে মেরিনো ভেড়া পর্যন্ত রাজি আছি। আঙ্গোরা ছাগ বা উট হইলে আমাদের আপত্তি আছে। কেন আছে তাহা বোধ করি স্পষ্ট করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

কম্বল সম্বন্ধে মুসলিম লীগ বলিল—কম্বল আমরা সকলেই ব্যবহার করি। তবে বাংলা দেশে কম্বলের কল স্থাপিত হইলে ইহার জন্য প্রয়োজনীয় লোম কোথা হইতে আসিবে তাহার উপরে আমাদের সহানুভূতি সম্পূর্ণ নির্ভর করে। যদি আপনারা একমাত্র 'মোহেয়ার' দিয়া কম্বল প্রস্তুত করেন তাহা হইলে আপনাদের কম্বল আমরা গ্রীষ্মকালেও ব্যবহার করিতে রাজি আছি।

মিল স্থাপনের কাজ দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। লোমও জোগাড় হইতেছে। কিন্তু কল চালাইবার জন্য অভিজ্ঞ লোক পাওয়া যাইতেছে না। পানু তাহাতে কিছুমাত্র দমে নাই। সে স্কটল্যাণ্ডের একটি মিলের সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান করিতেছে, এবং প্রথম অবস্থায় সেইখান হইতেই অভিজ্ঞ লোক আসিবে প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছে।

পানু কিন্তু এ-সব কথাই দেশের মধ্যে প্রচার করিতেছে এবং দেশের লোককে লোম সম্বন্ধে নানা রূপ বক্তৃতা দিয়া বিস্মিত করিতেছে।

কে জানিত যে হেরোডোটাস্-এর বিবরণীতে প্রাচীন কালে ব্যাবিলনবাসীদের উলের পোষাক ব্যবহারের কথা উল্লেখ আছে?

কে জানিত, প্রাচীন গ্রীসের লোকেরা উল দিয়া কম্বল প্রস্তুত করিতে পারিত?

কে জানিত, রোম্যানগণ উলের যাবতীয় কাজে অভিজ্ঞ ছিল?

কে জানিত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে দশ প্রকার কম্বলের উল্লেখ আছে ?

কে জানিত, রোম্যানদের সময়ে ইংলণ্ডের উইনচেস্টার নামক শহরে একটি উলের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল ?

তা ছাড়া মধ্যযুগে ফ্লাণ্ডার্সে যে উলের জিনিষ প্রস্তুত হইত এবং সেখান হইতে তাঁতী আনাইয়া ইংলণ্ডে উলের তাঁত চালান হইত—এ-সব সংবাদই বা কে জানিত ?

পানু উন্মাদের মতো বাংলা দেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া রোম-বিষয়ক এই সব মূল্যবান ইতিহাস রোমহর্ষক ভাষায় প্রচার করিতেছে। সে এমন কথাও একদিন বলিয়াছে যে ইটালির রাজধানীর নাম সম্বন্ধে তাহার মনে একটি ঘোরতর ঐতিহাসিক সন্দেহ জাগিয়াছে।

ইহা দ্বারা সকলেই পানুর কম্বল-মাহাত্ম্য বিষয়ে সবিশেষ অবগত হইয়া এক দিকে যেমন অভয়কে আর একদিকে তেমনই পানুকে যথাক্রমে রেলগাড়ি ও এঞ্জিনের সহিত তুলনা করিতে লাগিল।

একদিন একটি ছোটখাটো সভায় পানু তাহার বক্তৃতা দিতেছিল। তাহার বক্তব্য এই যে, বাঙালীর কম্বল বাঙালী-কেই যে কিনিতে হইবে তাহা নহে। কম্বল বাংলা দেশে প্রস্তুত হইবে বটে, কিন্তু তাহার প্রচার হইবে ভারতবর্ষের সর্বত্র। এইটি হইল ইহার ব্যবহারিক দিক। ইহা ছাড়া কম্বলের একটি সংস্কৃতির দিক আছে। ইহা দ্বারা ভারতবর্ষের

বিভিন্ন মতাবলম্বী লোকের মধ্যে ঐক্য স্থাপন সহজে হইতে পারে। কম্বল সকলকেই ব্যবহার করিতে হয়—ত্যাগী ও ও ভোগী নির্বিশেষে কম্বল সকলেরই আশ্রয়। কম্বল গৃহস্থেরও চাই, সন্ন্যাসীরও চাই।

পানু কথা আরম্ভ করিলে সহজে শেষ করিতে চাহে না। তাহার ভাষায় এমন একটা উন্মাদনা আছে যাহাতে সে নিজেই সে সময় উন্মাদ হইয়া ওঠে। ইহাই তাহার কথা বলার নিজস্ব ভঙ্গী। তামাক কিংবা আলকাতরার ব্যবসা হইলেও পানু ঠিক এই ভাবেই নিজেকে এবং অপরকে মাতাইয়া তুলিতে পারিত।

সভায় বক্তৃতা চলিতেছিল। একজন মাড়োয়ারী এই সভায় উপস্থিত ছিল। সে পানুর বক্তৃতা শুনিয়া একটু বেশি মুগ্ধ হইল, এবং পানুকে ডাকিয়া নিজের বাড়িতে লইয়া গিয়া একটি পরামর্শে মত্ত হইল। তারপর হইতে অন্ততঃ সাতদিন পর্য্যন্তও পানুকে কেহ বক্তৃতা দিতে দেখিল না। পানুকেও কেহ দেখিল না। বাংলা দেশের আবহাওয়ায় যেন একটা গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল।

পানু এতদিন শুধু বক্তৃতা দিয়াই কারখানাটি সচল করিয়া রাখিয়াছিল, সেই পানু হঠাৎ একেবারে ডুব মারিল! অভয় তাহাকে কোথায়ও খুঁজিয়া না পাইয়া চোখে সরিষার ফুল দেখিতে লাগিল। পানুর অভাবে তাহার প্রত্যেকটি মুহূর্ত

বিস্বাদ হইয়া গেল—মনে নানারূপ আশঙ্কা জাগিল এবং তাহার কারখানাটিও মূল্যহীন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মাত্র এক-এক সময় মনে আশা জাগে। তাহার মনে হয়, পান্নু নিশ্চয় ইচ্ছা করিয়া এরূপ করিতেছে না। পান্নু প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, একসঙ্গে ভাসিব কিংবা একসঙ্গে ডুবিব—সেই পান্নু কৃতঘ্ন হইয়া সরিয়া পড়িবে ইহা একেবারে অসম্ভব।

কিন্তু কারখানার ভিতরে গেলেই অভয়ের মন দমিয়া যায়। যদি পান্নু আর ফিরিয়া না আসে!…

প্রতিদিন প্রকাণ্ড একগাদা ভেড়ার লোমের মধ্যে বসিয়া অভয় কারখানার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা করিতে থাকে। কিন্তু চিন্তা করিতে গিয়া সমস্তই গোলমাল হইয়া যায়। এইভাবে কিছুকাল কাটিল।



এক গাদা লোমের মধ্যে বসিয়া…

পান্নুর উদয় হইল দিন-দশেক পরে। তাহার চেহারা উন্মাদের মতো। অভয় তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল।

কিন্তু পান্নু তাহাকে আনন্দ দিতে আসে নাই। সেজন্য সে গভীর দুঃখিত, কিন্তু উপায় নাই।

পানু বলিল, আমরা অনেক আশা ক'রেই অনেক কিছু করি কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের আশা পূর্ণ হয় না।

অভয়ের চোখমুখ ভয়ে ফ্যাকাশে হইয়া গেল।

পানু বলিতে লাগিল বাঙালীর দ্বারা কম্বলের মিল চালানো অসম্ভব, এই কথাটাই আজ উপলব্ধি করেছি। অভয় ভয়ে কাঁপিতে লাগিল।

পানু বলিয়া চলিল, আজ একা ব'সে চিন্তা করতে গিয়ে দেখি আমরা ভুল করেছি। কোনো কিছু করতে গেলে শুধু উৎসাহ আমাদের চিরদিন ধ'রে রাখতে পারে না। যদি কোনো কিছুর বীজ অন্তর্নিহিত না থাকে তা হ'লে গাছ জন্মাবে কিসে? আমি চিন্তা ক'রে বুঝতে পেরেছি বাঙালীর কোষ্ঠীতে কম্বলের চিহ্ন নেই। আর এইটেই তো স্বাভাবিক। বাংলা দেশ গ্রীষ্মপ্রধান।

অভয়-দা ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, তাহলে এত টাকা সব নষ্ট হবে?

পানু বলিল, সংসারে কিছুই নষ্ট হয় না। যাকে আমরা নষ্ট হওয়া বলি তা অন্য মূর্তিতে রূপান্তরিত হয় মাত্র।

অভয় বলিল, জানি, সেটা কয়েক মাস আগেই কলেজে পড়েছি। কিন্তু তাতে সান্ত্বনা কোথায়?

পানু স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিল, সান্ত্বনা এই যে এক লাখ টাকা খরচ ক'রে আমাদের এত বড় অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল। সংসার আমাদের কাছ থেকে টাকা আদায় না ক'রে কিছুই দিতে চায় না—কোনো শিক্ষাই না। এমন কি অসাবধানে পকেটে টাকা

নিয়ে পথ চলা অন্যায় এ শিক্ষাও পকেট কাটা না যাওয়া পর্যন্ত আমরা লাভ করি না। টাকা তোমার কিছু গেল—কিছু কেন, তোমার হয় তো যা ছিল সবই গেল—কিন্তু সংসারে যারা টাকাকেই বড় ক'রে দেখে তাদের মতো হতভাগা আর কে আছে? আমরা পুরুষ, আমরা নিজেকে কোনো কিছুর সঙ্গে জড়াই না—আমরা সদা মুক্ত।—এইটে বিশ্বাস কর এবং এই বিশ্বাস নিয়ে এই সংসারের হাটে বেচাকেনা কর—তারপর যেদিন ওপার থেকে ডাক আসবে সেদিন কাকে কি পরিমাণ দিয়ে যাবে এ সব নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না—মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শ্মশানে যাবার লোকের কথাই ভাবতে পারবে, উইলের সাক্ষীর কথা ভাবতে হবে না। বেরিয়ে পড় পথে—পথই আমাদের একমাত্র আশ্রয়—এ-পথে চলতে একখানি মাত্র কম্বলের দরকার এবং তার জন্যে মিল চালাবার কোনোই প্রয়োজন নেই।

পানুর আবেগ ক্রমশ বাড়িয়া চলিল এবং বক্তৃতার স্রোতে তাহার অভয়-দা ভাসিয়া চলিল, তাহার হাত পা শিথিল হইয়া আসিল, নিজেকে নিজে আর আয়ত্তে রাখিতে পারিল না। প্রায় আধঘণ্টা এইভাবে কাটিবার পর অভয় সম্পূর্ণ মুক্ত পুরুষে পরিণত হইল, এবং টাকার মূল্য যে এত কম তাহা সে এই প্রথম অনুভব করিয়া যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

হঠাৎ গুরুতর আঘাত পাইলে লোকের বোধশক্তি কিছুক্ষণের জন্য লুপ্ত হয়—কিন্তু এই অবস্থা তাহার বেশিক্ষণ থাকে না, ক্রমশই আহত স্থানটি বেদনায় টন্‌টন্ করিতে থাকে।

অভয়ের মনের অবস্থাও ঠিক তাহাই হইল। মিল বন্ধ করিতে হইবে এ আঘাত তাহার পক্ষে গুরুতর হইয়াছিল বলিয়াই সে আঘাতের গুরুত্ব প্রথমে বুঝিতে পারে নাই। তদুপরি পানুর বক্তৃতার প্রলেপে বোধশক্তি তাহার আরও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল —কিন্তু পানু চলিয়া যাইবার পর হইতে সে ধীরে ধীরে নিজের অবস্থার গুরুত্ব বুঝিতে আরম্ভ করিল।

উপরন্তু অভয় সংবাদ পাইল পানু তাহাকে ভয়ানক ঠকাইয়াছে। সে নাকি এক মাড়োয়ারীর সঙ্গে যোগ দিয়া পৃথক একটি কম্বলের মিল খুলিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। আরও শুনিতে পাইল পানু সেখানে আর অংশীদার নয়, লভ্যের অনিশ্চিত অংশের আশায় আর তাহাকে অনির্দিষ্টকাল অপেক্ষা করিতে হইবে না, পানু পাঁচ শত টাকা বেতনে সেখানে ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছে।

পানুর বিশ্বাসঘাতকায় অভয় একেবারে ভাঙিয়া পড়িল। হঠাৎ তাহার মনে হইল পানু একজন অভিনেতা। এই কথাটি মনে হইবার পর হইতে সে পানুর আগাগোড়া ব্যবহার স্মরণ করিয়া দেখিল এবং ক্রমেই বুঝিতে পারিল পানু আগাগোড়া তাহার সহিত অভিনয় করিয়াছে। ঘরে এবং বাইরে সর্বত্র সে অভিনয় করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে।

অভয় একজন অভিনেতার বাক্‌চাতুরীতে এমন করিয়া ভুলিল। মস্তিষ্ক অনেকটা স্থির হইলে মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল পানু এ কয়েক মাসে কম করিয়াও তাহার

পঞ্চাশ হাজার টাকা মারিয়াছে এবং নগদ টাকা প্রায় ফুরাইয়া আসিবার মুখে সরিয়া পড়িয়াছে।

এখন একা সে এই সব কল লইয়া কি করিবে? অভিজ্ঞ লোক আসিলেই কি সে মিল চালাইতে পারিবে? অভয়ের নিজের উপর আর আদৌ বিশ্বাস নাই। সে নিজের বুদ্ধিতে ব্যবসা করিলে এত কিছু করিতে সাহস পাইত না, ছোটখাট কিছু করিত। কারণ এত বড় জটিল কল চালাইবার মতো উৎসাহ বা প্রবৃত্তি বা বুদ্ধি তাহার কোনো দিনই ছিল না। তাই একদিকে তাহার প্রিয় ভাই সরিয়া পড়াতে সে যেমন আঘাত পাইল—আর এক দিকে তেমনি এত বড় একটি মিল তাহার ঘাড়ে চাপিয়া থাকাতেও তাহার সোয়াস্তি হইল না।

কম্বলের কল কম্বলের চেয়েও ভয়ানক। কম্বল ছাড়িলেও কম্বলের কল তাহাকে এখন ছাড়িতেছে না। সুতরাং দুর্ভাগ্য দুইটি। কিন্তু যুগপৎ দুইটি দুর্ভাগ্যই তাহাকে দুই দিক হইতে ক্রমাগত আঘাত করিতে থাকিলে সে হয়তো উন্মাদ হইয়া যাইত। ভগবান এই ভয়াবহ পরিণাম হইতে আপাতত তাহাকে রক্ষা করিলেন। এই সময় একটি অজ্ঞাত লোকের সঙ্গে তাহার পরিচয় হইল এবং সেই লোকটি তাহার মিল কিনিতে পারে এরূপ ইঙ্গিত করিল।

হাতে স্বর্গ নামিয়া আসিলেও হয় তো অভয় এত আনন্দিত হইত না। যে কোনো মূল্যে এই দায় হইতে তাহাকে উদ্ধার পাইতেই হইবে। তাই অভয় তাহাকে

ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করিয়া মিলটাকে একরূপ দান করিয়াই দিল। মূল্য যাহা পাইল তাহা সে তাহার নিজের নিকটেও প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইল।

কিন্তু এই মুক্তির আনন্দ তাহার একটি সপ্তাহও ভোগ করা হইল না। অভয় চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই শুনিতে পাইল যে-লোকটি মিল কিনিয়াছে সে পান্নুর লোক এবং যে-টাকায় কিনিয়াছে সে সেই মাড়োয়ারীর টাকা! কিন্তু তাহার আর কিছুই করিবার উপায় নাই। পান্নুর কৃতঘ্নতা তাহাকে এক দিনে পশুর ধাপে নামাইয়া আনিল। সে ঠিক করিল পান্নুকে ধরিয়া মাথা হইতে পা পর্যন্ত একেবারে তুলা ধুনিয়া দিবে। দৈহিক শক্তির সঙ্গে তাহার মানসিক শক্তির যেটুকু অসামঞ্জস্য ছিল, মনে হিংসা জাগিয়া উঠাতে সেই অসামঞ্জস্য দূর হইল। তাহার নৈতিক জোর অস্বাভাবিক বাড়িয়া গেল—এবং তাহার মনে হইতে লাগিল যেন এখন সে কম্বলের কল একাই চালাইতে পারে।

পান্নু ঘুঘু, পান্নু চোর, পান্নু ধাপ্পাবাজ, পান্নু কুলাঙ্গার, পান্নু ইতর, পান্নু ডাকাত, পান্নু খুনে, পান্নু অভিনেতা—অভয়ের মনশ্চক্ষুর সম্মুখ দিয়া পান্নুর এই ধারাবাহিক চিত্রগুলি সিনেমা-চিত্রের মতো সেকেণ্ডে চব্বিশখানা করিয়া ছুটিয়া চলিল।

অভয় তাহার গাড়ির তেল পুড়াইয়া পথে ঘাটে সর্বত্র পান্নুর বিরুদ্ধে নানারূপ কুৎসা রটাইয়া ফিরিতে লাগিল। ইহা ছাড়া

তাহার বর্তমানে আর কোনও কাজ নাই। এই সময়ে অভয়ের কয়েকটি বিবাহ সম্বন্ধ আসিয়াছিল কিন্তু যাহারা এ-সব কথা বলিতে আসিয়াছিল অভয় তাহাদিগকে শুধু গায়ে হাত তুলিতে বাকি রাখিয়াছে। একটি কনের পিতাকে সে তাড়া করিয়া রাস্তায় পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়াছে। পানু ছাড়া আর কাহারও কথা ভাবিবার তাহার সময় নাই।

এই অভিনেতা-পানুকে জব্দ করিতে হইবে। তাহাকে আঘাত করিতে হইবে, অন্তরে নয়—বাহিরে। এবং একআধ জায়গায় নয়, সর্বাঙ্গে।

অভয় যাহাকে পায় তাহারই কাছে পানুর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। বলে, এমন অভিনেতা দেখেছ? বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতার বাহান্ন পুরুষকে অভিনয় শেখাতে পারে। যাকে তোমরা অভিনেতা ব'লে গর্ব কর, সে এর পায়ের কাছে ব'সে সারা জীবন অভিনয় শিখলেও এর এক কণা আয়ত্ত করতে পারবে না।

অভয় তাহাকে পথে পথে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। পানু কোথায় থাকে—তাহা সে জানে না, পূর্বে যেখানে থাকিত এখন সেখানে সে থাকে না। কিন্তু যেখানেই থাক, কারখানায় তাহাকে আসিতেই হইবে। সেইজন্য কারখানার পথে মাঝে মাঝে গাড়ি লইয়া সে ঘুরিয়া যায়।—একদিন না একদিন তাহার দেখা নিশ্চয় পাওয়া যাইবে—এবং দেখা পাওয়া গেলে তাহাকে আর ছাড়িবে না। কিন্তু পানু যে কয়েক দিন হইল

শহর ছাড়িয়া মিলের কাজে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে তাহা সে জানিত না। তাই মিলের পথে তাহার দেখা মিলিতেছে না।

অভয়ের বিশ্রাম নাই। তাহার জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য, সমস্ত আদর্শ, সমস্ত ভবিষ্যৎ এবং সমস্ত আয়োজন একটি মাত্র কাজের ভিতরেই সার্থকতা লাভ করিবে, একটি মাত্র কাজই তাহার সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবে। পানুর হাত ভাঙিতে হইবে, পা ভাঙিতে হইবে, তাহার পর কম্বল জড়াইয়া তাহার উপর লাঠি চালাইয়া সমস্ত অঙ্গ থেঁতো করিতে হইবে, তার পর তাহা ছুরি দিয়া কাটিয়া কাটিয়া তাহার মধ্যে নুন পূরিয়া দিতে হইবে, সর্বশেষে তাহার শির লক্ষ্য করিয়া শেষ আঘাত। সেই একটি আঘাতে পানুর অভিনয়-জীবনের শেষ।—এমন সাংঘাতিক অভিনয়ও মানুষ করিতে পারে!

রঙ্গমঞ্চে যে-লোকটি শয়তানের ভূমিকা অভিনয় করে তাহাকেও আমরা প্রশংসা করি, কিন্তু যাহার অভিনয় রঙ্গমঞ্চের বাহিরে, সে মানুষের চিরশত্রু। পানুকে মরিতে হইবে।

অভয়ের মনোভাব এবং যুক্তি স্বাভাবিকত্বের সীমা কিছুদিন হইতেই ছাড়াইয়া গিয়াছে।

সে দিনও দৈনিক কর্তব্যের তাগিদে অভয় পানুকে খুঁজিবার জন্য টালিগঞ্জের পথে গাড়ি লইয়া ঘুরিতেছিল এমন সময় পরিচিত কণ্ঠে 'অভয়-দা' ডাক শুনিয়া অভয় চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখে পানু তাহাকে ডাকিতেছে।

পানু ললাটদেশ বিস্ময়ে কুঞ্চিত করিয়া চীৎকার করিয়া

বলিতে লাগিল, এ কি অভয়-দা, তোমার চেহারা এত খারাপ হয়ে গেছে, ছি ছি ছি, তুমি কি হয়েছ বল দেখি?—তোমার দিকে যে একেবারে চাওয়া যায় না! কোথায় চলেছ?



ছি ছি ছি, তুমি কি হয়েছ বল দেখি?

বলিতে বলিতে নিজেই গাড়ির দরজা খুলিয়া তাহার পাশে গিয়া বসিল।

পানুকে দেখিবামাত্র অভয়ের মন হইতে মন্ত্রবলে আধ মিনিট পূর্ব হইতে গত মাসখানেকের সমস্ত স্মৃতি লুপ্ত হইল।

অভয় বলিল, পানু কোথায় চলেছ?

পানু বলিল, একবার ডালহৌসি স্কয়ারে যাব, তা তোমাকে পেয়ে ভালই হ'ল, চল।

অভয় ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেগে গাড়ি ছুটাইয়া দিল।

পানু ক্রমাগত অভয়-দার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দুঃখ প্রকাশ করিতে

করিতে চলিল, একটা টনিকের নামও বলিয়া দিল। তাহার পর বাঙালী-চরিত্রের বিরুদ্ধে পানু চিত্তাকর্ষক ভাষায় এমন সব অভিযোগ করিতে লাগিল যে অভয় নিজের বাঙালীত্বের জন্য লজ্জায় যেন মাটিতে মিশাইয়া গেল। টালিগঞ্জের ব্রিজ হইতে ডালহৌসি স্কয়ার পর্যন্ত এ রকম দীর্ঘ একটানা লজ্জা সে জীবনে পায় নাই।

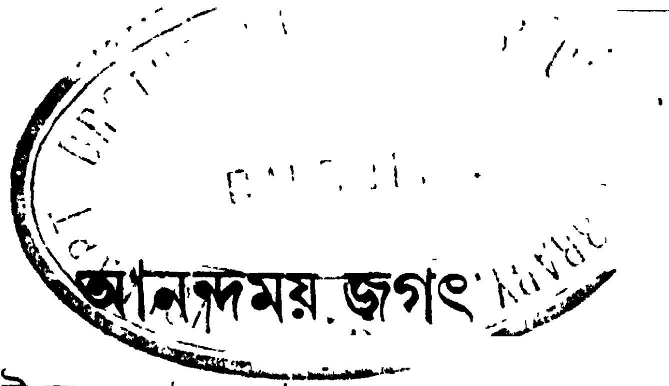
অভয় পানুকে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাইয়া দিল—পানু তাহাকে একটু ধন্যবাদও দিল না। বরঞ্চ বলিল, অভয়-দা তোমাকে আর কি বলি, যদি দাদা না হয়ে ছোট ভাই হ'তে তা হ'লে এই স্বাস্থ্য দেখে তোমার গালে দুটো চড় বসিয়ে তোমাকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সচেতন ক'রে তুলতাম।

অভয়ের মুখে সলজ্জ শুষ্ক হাসি।

পানু এক মুহূর্তে ভিড়ের মধ্যে মিলাইয়া গেল। অভয় শূন্যমনে বাড়ি ফিরিয়া হঠাৎ যেন ভূমিকম্পের এক প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়া ঘুরিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল।

···অভিনেতা আবার অভিনয় ক'রে গেল!···কিন্তু ইহার বেশি আর কিছু সে তখন চিন্তা করিতে পারিল না।

(প্রবাসী অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭)



আনন্দময় জগৎ

পৃথিবীতে দুই দল লোক আছে। এক দল বলে, জগৎটা আনন্দময়, অপর দলের মতে জগৎটা দুঃখে পূর্ণ। কথায়ও বলে, আনন্দবাদী স্টীম বয়লার আবিষ্কার করিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে সেফ্‌টি ভালভ্‌ লাগাইয়াছিল দুঃখবাদী। দল যে দুইটি, ইহা তাহার একটি প্রমাণ।

আমি ছিলাম দুঃখবাদীর দলে। তাহার কারণ, আমার স্বাস্থ্যটি ছিল বহুদিন হইতেই খারাপ, এবং ঐ সঙ্গে মনও। বলা বাহুল্য, এই জন্যই দুঃখবাদীর যুক্তিটা আমার মনে সহজে স্থান পাইয়াছিল।

তাহা ছাড়া বাহিরের লোকেম মধ্যে নিকটতম সম্পর্ক ছিল আমার শুধু এক চিকিৎসকের সঙ্গে। এই চিকিৎসকের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করিয়া মন আরও খারাপ হইয়া যাইত। তিনি চিকিৎসা বিষয়ে অস্থিরচিত্ত ছিলেন, এবং আমার জন্য এমন সব ব্যবস্থা করিতেন যাহা আমার দীর্ঘকালব্যাপী ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার পক্ষে হয়তো কোনো প্রয়োজনই ছিল না। তাঁহার ব্যবস্থামতো অ্যালোপ্যাথি ঔষধ খাইয়াছি, হোমিওপ্যাথি ঔষধ খাইয়াছি, এবং শেষ পর্যন্ত হাইড্রোপ্যাথি মতে জলে বসিয়া প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়াছি, এবং পেটে মাটি মাখিয়াছি। কিন্তু কোনো ফলই হয় নাই। এই

ভাবে আমার বহু অর্থ তিনি জীর্ণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার কোনো ঔষধ বা পথ্য আমি জীর্ণ করিতে পারি নাই।

দীর্ঘ স্বাস্থ্য-সাধনার নিষ্ফলতায় মনে আকস্মিকভাবে একদিন বৈরাগ্যের উদয় হইল এবং সেইদিনই চিকিৎসককে বিদায় করিয়া দিয়া স্থির করিলাম, জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটা দিন চিকিৎসকের গণ্ডীর বাহিরে কাটাইব।

কিন্তু বাহিরে আসিয়া দেখি, বাহিরের প্রত্যেকটি লোকই চিকিৎসক। এই জ্ঞান লাভ করিয়া একদিক দিয়া আমার উপকারই হইয়াছে। কারণ জগৎ যে আনন্দময় তাহাও এই সময় হইতে আমার বিশ্বাস হইয়াছে। একবার যদি কেহ জানিতে পারে কাহারও অসুখ করিয়াছে তাহা হইলে অসুস্থ লোকের আর চিন্তা নাই। চারিদিক হইতে অযাচিত ব্যবস্থা অবিরাম তাহার হাতে আসিয়া পড়িবে, ইহার জন্য কেহ কোনো মূল্য চাহিবে না।

জগৎ মনুষ্যত্বের এই প্রশস্ত ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে।

ভিত্তি প্রশস্ত এবং জগৎ উদার; এই কথাটি বলিবার জন্যই এতখানি ভূমিকার প্রয়োজন হইল।

আমি যে ডিস্‌পেপসিয়ার রোগী, আশা করি এতক্ষণে তাহা বুঝাইতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহার উপর সম্প্রতি হঠাৎ সর্দি লাগিয়াছে। ঔষধের জন্য কাহার পরামর্শ লইব? অথচ সর্দিটা ভয়ানক কষ্ট দিতেছে। মনে পড়িল কয়েক বৎসর পূর্বে আমার সর্দি হইয়া সহজে সারিতেছিল না, সেই সময় ডাক্তার

দুধের সঙ্গে দুই ফোঁটা করিয়া টিংচার আইওডিন খাইতে দিয়াছিলেন। সুতরাং সেদিন সান্ধ্যভ্রমণ শেষে কিছু টিংচার আইওডিন কিনিয়া ট্রামে বাড়ি ফিরিতেছিলাম। বোধ করি আমার ভিতরেও একটি ডাক্তার অঙ্কুরিত হইতেছিল।

সেদিন সন্ধ্যার প্রথম হাঁচিটি আত্মপ্রকাশ করিল ট্রামের মধ্যে একটি অপরিচিত বৃদ্ধ লোকের পাশে। আমার



জীবন-দর্শন পরিবর্তনের ইহাই সূচনা। হাঁচির সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক আমার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া বলিলেন, "এ যে দেখছি একেবারে কাঁচা সর্দি!—তা মশাই যদি কিছু মনে না করেন—"

উদ্যত আর একটি হাঁচি সংযত করিয়া জলভরা চোখে তাঁহাকে বলিলাম, "মনে করবার কিছু নেই।"

"না, আছে বইকি, অনেকেই আবার অফেন্স নেয় কি না, তাই অযাচিত কিছু বলতে ভয় হয়।"

"না, আপনি নির্ভয়ে বলুন।"

"কাঁচা সর্দিতে খুব ক'সে ঠাণ্ডা জলে স্নান করুন, সর্দির মূলোচ্ছেদ হয়ে যাবে। মশাই, সর্দি বড় ভয়ানক ব্যায়রাম—ওর চেয়ে মশাই দশদিন জ্বরে অচৈতন্য হয়ে থাকা ঢের ভাল।"

কথাগুলি সম্মুখের আসনে উপবিষ্ট এক ভদ্রলোকের কানে গিয়া তাঁহার অন্তরস্থ সুপ্ত চিকিৎসককে জাগ্রত করিল। ঘাড় ফিরাইয়া বলিলেন, "ঠাণ্ডা জলে কিন্তু আবার বিপদও আছে, চট্ ক'রে সর্দি বুকে ব'সে নিউমোনিয়া পর্যন্ত হ'তে পারে।—তার চেয়ে গরম জলে পা ডুবিয়ে রাখায় অনেক উপকার।"

তাঁহার পার্শ্বস্থ ভদ্রলোক এ-কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "গরম জল নয় মশাই, ও সব বড়লোকী ব্যবস্থা। আমাদের মতো যারা ট্রামে চলাফেরা করে তারা কি গরম জলের হাঁড়ি পায়ে বেঁধে বেড়াবে?"

"তার মানে?"

"তার মানে নস্যি। নস্যিই হচ্ছে কাঁচা সর্দির সেরা ওষুধ।"

আমার পার্শ্বস্থ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে জোড়হাত করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আমার ঘাট হয়েছে ক্ষমা করুন, আমি আর এর মধ্যে নেই। আগেই ভেবেছিলাম কথা থাকবে না, তবু বলতে গেলাম। যত সব—" বলিয়া তিনি উঠিয়া পড়িলেন; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সে দিকে কেহই বিশেষ লক্ষ্য করিল না। কারণ ঠিক এই সময় সকলকে অবাক করিয়া ট্রাম কণ্ডাক্টর বলিয়া

উঠিল, "বাবু, গরীবের একটা কথা শোনেন তো বলি।" আমরা সকলেই তাহার দিকে চাহিলাম। সে সবগুলি দাঁত বাহির করিয়া উৎসাহিত ভাবে বলিল, "সদির ওষুধ হচ্ছে গরম জিলিপি।" দাঁত তাহার বাহির হইয়াই রহিল।

কিন্তু বিস্ময়ের পর বিস্ময়! কণ্ডাক্টরের পাশে ইনস্পেক্টর দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারও খোলস ভেদ করিয়া বৈদ্য বাহির হইয়া আসিল। আমাদের আলোচনা হঠাৎ তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিয়া গেল এবং বলিল, "সর্দির ওষুধ হচ্ছে উপোস।"

কথাটা শুনিয়া কণ্ডাক্টর মহা অপরাধীর মতো তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

এই সুযোগে আমার পিছন হইতে এক ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, "সর্দিতে কিন্তু নাকের চেয়েও গলার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত বেশি। তার কারণ হচ্ছে, সর্দি নাক দিয়ে গিয়ে গলা আক্রমণ করে এবং ফলে যে কাসি হয় তা সারতে যুগযুগান্তর কেটে যায়।"

এইবার সম্মুখের আসনের পুস্তক-পাঠরত এক ভদ্রলোকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল। এবারে যিনি দেখা দিলেন, তিনি বৈদ্য নহেন, বৈদ্য-নাশন। তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ভাবে হঠাৎ একবার পিছনে চাহিয়া বলিলেন, "মশাইরা কেন অনর্থক চেঁচাচ্ছেন, সর্দির কোনো ওষুধ নেই···আর, কোনো কালে ছিল না···আর, কোনো কালে হবে কি না তাও কেউ বলতে পারে না।"

কথাগুলি বলিয়া তিনি পূর্ববৎ গম্ভীরভাবে পুস্তকের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। আমার নিকটস্থ প্রতিবেশীরা পরস্পর ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিলেন, এবং মুহূর্তে যেন সকলেই সমবিপদে সমদলস্থ হইলেন। ইহাতে উৎসাহ পাইয়া এক জন বলিলেন, "তা হ'লে মশাইয়ের মতে ওষুধ মাত্রেই মায়া ?"

পাঠরত ভদ্রলোকটি পুনরায় ঘাড় ফিরাইয়া বিদ্রূপের সুরে বলিলেন, "যে আজ্ঞে।" এবং হঠাৎ বাহিরে তাকাইয়া বুঝিলেন তিনি প্রায় গন্তব্য স্থানে পৌঁছিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে ইন্‌স্‌পেক্টর নামিয়া গিয়াছে ; সুতরাং এই ফাঁকে কণ্ডাক্টর ইন্‌স্‌পেক্টরের কাছে আমাদের সম্মুখে নিজের মতবাদ লইয়া যে হীনতা স্বীকার করিয়াছিল, সেই লজ্জা দূর করিবার জন্য মরীয়া হইয়া উঠিল। সে টিকিট বিক্রি বন্ধ রাখিয়া পুনরায় আমাদের কাছে আসিল এবং বলিল, "গরম জিলিপি খেয়ে মশাই তিন পুরুষের সর্দি আমার ভাল হয়ে গেছে, যা-তা বললেই শুনব কেন ?—গরীবের কথাটা পরীক্ষা করেই দেখুন না সার্।

এ দিকে ট্রাম-ড্রাইভার ঘণ্টার অভাবে গাড়ি চালাইতে না পারিয়া কণ্ডাক্টরের উপর মহা খাপ্পা হইয়া উঠিল। একবার নহে, কণ্ডাক্টর বার বার তাহার কর্ত্তব্যে অবহেলা করিতেছে! জানালা দিয়া গাড়ির ভিতরে মাথা গলাইয়া দিয়া সে কণ্ডাক্টরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কণ্ডাক্টর

গাড়ি চালাইবার ঘণ্টা দিয়া ড্রাইভারকে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিল, মূল কারণ সর্দি।

সর্দি! প্রতিভাবান ড্রাইভার গাড়ি চালাইতে চালাইতে হঠাৎ সব ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, "দাওয়াই হোয় তো কিছু বাতলে দিতে পারি।"



ইতিমধ্যে আমি গন্তব্য স্থানের কাছে আসিয়া পড়িলাম। সুতরাং ড্রাইভারের ব্যবস্থা শুনিবার আর প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু উঠিতে গিয়াও বিপদ। আমার পিছনের ভদ্রলোক আমার জামা টানিয়া ধরিয়া বলিলেন, মশাই উঠবেন না, মজাটা দেখেই যান না।"

কিন্তু মজা দেখা হইল না। আর একটি গুরুতর মজার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। অর্থাৎ ড্রাইভারের কথা শেষ

হইবার মুহূর্ত পরেই চলন্ত ট্রাম হঠাৎ এক ঝাঁকানি দিয়া থামিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে এবং বাহিরে ভয়ানক



গোলমাল আরম্ভ হইল।' একটা দুর্ঘটনা বাঁচাইতে গিয়া সর্দির ঔষধ-চিন্তায় মগ্ন ড্রাইভার হঠাৎ ট্রাম থামাইয়া দিয়াছে। ফলে বাহিরের দুর্ঘটনা বাঁচিয়া গিয়াছে, কিন্তু ভিতরে একটি নূতন দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ভিতরের এক দণ্ডায়মান যাত্রী হঠাৎ ঝাঁকানির টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া গিয়া আহত হইয়াছেন।

আমারই সর্দি উপলক্ষ করিয়া এমন একটা কাণ্ড ঘটিতে পারে ইহা কল্পনা করিতে পারি নাই। কিন্তু লোকটির আঘাতের দায়িত্ব যে আমারই! তাই তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে গিয়া তাঁহাকে তুলিলাম। কিন্তু এ কি! এ যে আমাদেরই সেই বন্ধু, যিনি বলিয়াছিলেন সর্দির কোনও ঔষধ নাই! তাঁহারই হাতের ছাল উঠিয়া গিয়া রক্ত ঝরিতেছে এবং পায়েও এত আঘাত লাগিয়াছে যে উঠিবার শক্তি নাই!

ভদ্রলোককে উঠাইয়া আসনে বসাইয়া দিলাম। কিন্তু সুস্থ হইয়াই তিনি আমাকে কাতরভাবে বলিলেন, "নেমে কোনো ডাক্তারখানায় ঢুকে কিছু ওষুধ লাগানো দরকার।"

আমার মনে পড়িল টিংচার আইওডিনের কথা, এক আউন্স পরিমাণ আমার পকেটেই আছে। শিশিটি বাহির করিয়া রুমালের সাহায্যে ছালওঠা জায়গায় লাগাইয়া দিতে লাগিলাম। ভদ্রলোক যন্ত্রণায় প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

ইতিমধ্যে ট্রামের যাত্রীর অদল বদল হইয়াছে। বহু নূতন যাত্রী আমাদের দুই পাশে বসিয়াছে। তাহাদের একজন এই ভদ্রলোকের দুর্দশা দেখিয়া বলিল, "মশাই, মেডিকেল্ কলেজে নিয়ে এমার্জেন্সি ওয়ার্ডে অ্যান্টিটিটেনাস সিরাম্ লাগান, আইডিন-ফাইডিন পরে করবেন।"

আর একজন যাত্রী বলিল, "কিছুই করতে হবে না মশাই, খানিকটা বরফ লাগিয়ে দিন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে গেছে।"

আর এক জন যাত্রী তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিল,—

কিন্তু কি বলিল, তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া দ্বিতীয় আর একটি গল্প ফাঁদিয়া লাভ কি ?

(প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৫)

রাজকন্যার কথা

রাজকন্যার অসুখ। দেশদেশান্তর থেকে বৈদ্য এসে চিকিৎসা করছে কিন্তু অসুখ কিছুতেই সারে না। বৈদ্যেরা জবাব দেয়, বলে আমাদের অসাধ্য ব্যাধি, শাস্ত্রসঙ্গত চিকিৎসায় সারবার নয়। তবে যদি কোনো গুণীলোক দৈবাৎ সারিয়ে দিতে পারে তবেই রাজকন্যা বাঁচতে পারে।



রাজা তা শুনে রাজ্যময় ঘোষণা করে দেন—যে তাঁর কন্যাকে ব্যাধিমুক্ত করতে পারবে তাকে রাজকন্যা এবং

অর্ধেক রাজত্ব দেওয়া হবে। ঘোষণা শুনে এক খঞ্জ বৃদ্ধ ভিখারী টোটকা ওষুধে রাজকন্যাকে সারিয়ে রাজকন্যা এবং অর্ধেক রাজত্বের মালিক হয়ে বসল।

এটুকু আমরা সবাই জানি—কিন্তু যেটুকু জানি না তার পরিমাণ অনেক বেশি। গল্পটা শুনে আমরা যতখানি নিশ্চিন্ত হই ঠিক ততখানি নিশ্চিন্ত হওয়াও আমাদের উচিত নয়। কেন নয় সেই কথাটাই বলছি।

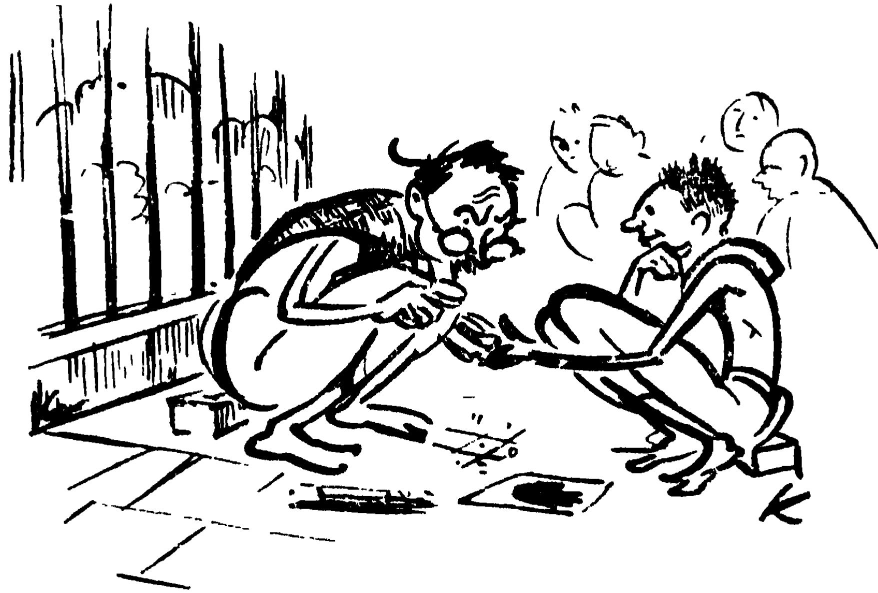
সেকালের রাজা ছিলেন অত্যন্ত নির্বোধ। তাঁর ভাগ্যও ছিল অত্যন্ত মন্দ। নির্বোধ ছিলেন এইজন্যে যে, যে-কন্যার প্রতি তাঁর এত মমতা (মমতাটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবশ্য লোকদেখানো) তাকে কোনো রকমে প্রাণে বাঁচিয়ে তোলাই পিতৃধর্ম পালনের পক্ষে তিনি যথেষ্ট মনে করতেন। তারপর তাকে যে-কোনো লোকের হাতে তুলে দেওয়া—সেও আবার অর্ধেক রাজত্ব ঘুস দিয়ে!—কন্যার প্রতি পিতার এ কি অদ্ভুত ব্যবহার! রাজকন্যাকে যে সারাতে পারবে—সেই তাকে বিয়ে করতে পারবে এটা কি বাড়াবাড়ি নয়? রাজকন্যার নিজের কি কোনো ইচ্ছে নেই—নিজের কোনো পছন্দ নেই—শুধু প্রাণে বেঁচে থাকার বিনিময়ে সে নিজের সমস্ত বাসনা বিসর্জন দিয়ে যে-কোনো একটা অন্ধ, খঞ্জ, মূর্খ বা ইতর লোককে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করবে! আর এই রকম একটা লোক অর্ধেক রাজত্ব পেলেই কি মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে রাজার সমান স্তরের লোক হবে? সম্পত্তির মালিক হয়ে

একটা বিকলাঙ্গ ভিখারী হঠাৎ ভদ্রলোক হয়ে উঠবে? কিন্তু সেকালের মতে তাই হ'ত। বিশেষ ক'রে সেকালের রাজার মতে। ধনতান্ত্রিক মনোভাবের এ একটি অধম দৃষ্টান্ত। সেকালের রাজা ছিলেন ধনতান্ত্রিক। যার যত টাকা তার তত কৌলীন্য—এই ধারণা ছিল তখন ধনী লোকের (বর্তমানের ধনী-লোকেরও এই ধারণা আছে—কারণ তারা হয়তো ওদেরই উত্তরাধিকারী।)

তা ছাড়া রাজার ভাগ্যও যে মন্দ ছিল তার প্রমাণ, সেকালের অধিকাংশ রাজাই ছিলেন পুত্রহীন। কিন্তু পুত্রহীন হ'লেও সন্তানহীন তাঁরা ছিলেন না। তাঁদের কন্যা থাকত, এবং রাজা-পিছু একটি ক'রে থাকত। আর সেই কন্যা একটা নির্দিষ্ট বয়স পার হ'লেই মারাত্মক অসুখে পড়ত এবং সেই অসুখ উপলক্ষে তার বিবাহ-সমস্যারও সমাধান হয়ে যেত। অর্থাৎ যে লোকটি সেই অসুখ সারাত সেই-ই হ'ত রাজার জামাতা। অন্য কথায় বিবাহযোগ্য বয়স হলেই রাজকন্যার মারাত্মক অসুখ হ'ত। এর মানে হচ্ছে অসুখটা একটা রূপক মাত্র। আসলে বিবাহের বয়সটাই ছিল রাজকন্যার ব্যাধি।

দেখা যাচ্ছে প্রজার মতোই রাজারও কন্যাবিবাহ কন্যাদায়ই ছিল। যে কোনো সুযোগে কন্যাকে বিদায় করা চাই। তা যদি না হবে তা হলে চিকিৎসকের হাতে রাজকন্যাকে সমর্পণ করার প্রশ্নই থাকত না। আর রাজত্বেরও অর্ধেক দেওয়ার

কোনো প্রয়োজন হ'ত না। অর্ধেক রাজত্বে একমাত্র যৌতুকেরই চেহারা ফুটে উঠেছে ! কন্যাবিদায়ই যে রাজার উদ্দেশ্য এতেই তা প্রমাণ হয়। কন্যা-বিদায় কন্যা-দায়কেই অনুসরণ করে। কিন্তু রাজকন্যাকে সারিয়ে তোলবার জন্যে রাজত্বের অর্ধেক নয়, হাজার ভাগের একভাগ দিলেও চিকিৎসক জুটে যেত। এমন কি একটি পয়সা না দিয়ে রাজসভা থেকে সেই চিকিৎসককে চিকিৎসাবিশারদ বা ধন্বন্তরী উপাধির একখানা ডিপ্লোমা দিতে চাইলেও বহু প্রার্থী জুটতে পারত। বর্তমান কালের রাজকন্যার অসুখ হলে যেমন হয়।



বর্তমান কালে আমাদের দেশে যারা সেকালের রাজার মতো, অর্থাৎ বর্তমান কালে ঋণের পরিমাণ যাদের সেকালের রাজার সম্পত্তিমূল্যের সমান (এটা অবশ্য গোপন থাকে) তাদের

কন্যার অসুখ হলে ঢাক পিটিয়ে কিছু ঘোষণাও করতে হয় না। অধিকাংশক্ষেত্রে বৈদ্য পূর্ব থেকে সন্ধান পেয়ে রোগিণীর দিকে লক্ষ্য রাখে। কিন্তু অর্ধেক রাজত্বের হিসাব নিতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় সেটা আমাদের জানা নেই।

বর্তমানের যুগে সেকালের মতো রাজাও নেই, রাজকন্যাও নেই, কিন্তু টোটকা-চিকিৎসকের বংশ ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। পথে বেরুলেই ফুটপাথের উপর যে সব দৈব-চিকিৎসকের ভীড় দেখি, সংবাদপত্র খুললেই যে সব দৈব ঔষধ ও মাদুলি-বিক্রেতার নাম দেখি, এদেরই পূর্বপুরুষ হয়তো সেকালে রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব পাবার সাধনা করত।

রাজকন্যা লাভের ঐ একটি মাত্র পথই উন্মুক্ত ছিল ব'লে দৈবচিকিৎসা-বিদ্যার তখন ব্যাপক অনুশীলন চলত। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে রাজা ও রাজকন্যার বংশ লোপ পেয়ে কেবল মাত্র অর্ধেক রাজত্ব-প্রার্থীদের বংশ কালক্রমে অসম্ভব রকম বেড়ে গেছে। এরা আগেও বেকার ছিল, এখনও বেকার।

রাজকন্যার অসুখটা রাজকন্যার একটা স্টাণ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়। বিবাহই যে মেয়েদের জীবনের আদর্শ এই সত্যটা হয় তো সেকালের রাজকন্যা নিজের ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জ্জন দিয়েও প্রচার করে গেছে এইভাবে। রাজা কোথায় রাজপুত্র খুঁজে বেড়াবেন—তার চেয়ে যে-কোনো লোকের সঙ্গে বিবাহটা ঘটে গেলে রাজার দুশ্চিন্তা ঘুচে যাবে।

অন্তত বিবাহসমস্যাটা তো মিটবে। তা ছাড়া সমাজসাম্য এবং ধনসাম্য-প্রতিষ্ঠাতেও এই জাতীয় বিবাহ বিশেষ সাহায্য করেছে।

অর্থাৎ সেকালের রাজা ছিল ক্যাপিট্যালিস্‌ট আর রাজকন্যা ছিল কম্যুনিস্‌ট। রাজকন্যার কৌশলে রাজার অর্ধেক রাজত্ব এই উপলক্ষে চ'লে যেত সর্বহারাদের হাতে। এর কোনো ব্যতিক্রম ছিল না। কেননা রাজকন্যার যে অসুখ, তা সর্বহারা ছাড়া আর কারো হাতে সারত না।···কিন্তু বিবাহের পরে রাজকন্যার কি অবস্থা হ'ল তার সন্ধান আমরা কেউ রাখিনি। গল্পকারও সে সব কথা চেপে গেছেন। সেটা আমাদের পক্ষে অবশ্য অনুমান করা খুব কঠিন হবে না।

বিবাহের পর রাজকন্যার জীবনে শান্তি নেই। খঞ্জ বৃদ্ধ তার স্বামী। তার পূর্ব স্ত্রী ও সাতটি সন্তান বর্তমান। তারা সবাই বিবাহিত এবং তাদেরও সন্তানাদি আছে। রাজত্ব চালাবার ক্ষমতা তাদের কারোই নেই। রাজত্বের মর্ম তারা বোঝে না। কাজেই রাজ্যরক্ষার ভার পড়ে রাজকন্যারই হাতে।

কিন্তু বৃদ্ধের পূর্ব স্ত্রী রাজকন্যার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে দিন কাটায়। তার যেখানে যত আত্মীয়-কুটুম্ব ছিল সবাই এসে বাড়ি দখল ক'রে বসে। তারা সাম্যবাদী নয়, বৈষম্যবাদী। রাজকন্যা তাদের অত্যাচার নীরবে সহ্য করে। সে জানে

অশিক্ষিত বর্বর হঠাৎ সম্পত্তির মালিক হ'লে এই রকমই হয়। সে তাই তাদের দুর্ব্যবহার হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে। কিন্তু যতই সে ঝগড়া করবে না মনে ক'রে নীরব থাকে ততই তারা মনে করে রাজকন্যা তাদের অগ্রাহ্য করছে।

অর্ধেক রাজত্ব থেকে যা আয় হয় ধনসাম্যবাদীর মনোভাব নিয়ে দিন কাটালে তাতে সবাই মিলে খুব প্রাচুর্যের মধ্যে থাকতে পারত, কিন্তু কেন যেন তাদের মনে হ'তে লাগল তারা যথেষ্ট পাচ্ছে না।

তাই একদিন দেখা গেল তারা ক্রমাগত সব জিনিসপত্র নিজেদের ঘরে এনে আটকাচ্ছে। বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়, আসবাবপত্র যা ছিল সবার, ক্রমশ তা সবই ব্যক্তিগত হ'য়ে উঠল। আস্তাবলের ঘোড়া আস্তাবল থেকে শোবার ঘরে উঠল। হাতীশালার হাতী শোবার ঘরের দরজায় বাঁধা পড়ল। পোষা পাখীগুলো ভাগ হয়ে প্রত্যেকের ঘরে গেল। কুকুর-বিড়ালও বাদ গেল না।

কিন্তু তবু তাদের মনে হয় রাজকন্যা তাদের প্রতি উদাসীন। যেন সে তাদের জন্মস্বত্ব কেড়ে নিয়ে তাদের উপর অকারণ অত্যাচার করছে। তাই তারা সবাই মিলে একদিন রাজকন্যাকে তার শোবার ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে।

তার আশ্রয় হ'ল পরিচারিকাদের ঘর। রাজকন্যা আর পরিচারিকায় এখন আর কোনো তফাৎ রইল না। রাজকন্যা অগত্যা একাই কম্যুনিস্টের জীবন যাপন করতে লাগল।

যথাসময়ে রাজার কানে কথাটা গেল, রাজা শুনে শুধু একটু হাসলেন। এ হাসি দুঃখের হাসি। অর্ধেক রাজত্ব দান করবার পর থেকে তিনি এতদিন মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন কি ক'রে দানপত্র প্রত্যাহার করা যায়, কিন্তু কিছুতেই কোনো কিনারা হয়নি। তাই এতদিন তিনি শুধু নিজের কৃতকর্মের জন্যে অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছিলেন, তার উপর এল এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ!



তিনি শুনলেন তাঁর জামাতার আত্মীয়স্বজনেরা কাড়াকাড়ি ক'রে অর্ধেক রাজত্ব শেষ ক'রে ফেলেছে—এখন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুনে তিনি যে আঘাত পেলেন তা আর কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। তাঁর মৃত্যু হ'ল।

এতদিন পর্যন্ত রাজকন্যার মন ছিল খুব শক্ত। কিন্তু আর শক্ত রইল না। যা ছিল সমানভাবে সর্বজনের, তাই ভাগ হয়ে হ'ল প্রত্যেকের ব্যক্তিগত; কম্যুনিজমের এই পরাজয়ে রাজকন্যার মন ভেঙে পড়ল।

সে আর কারো সঙ্গে কথা বলে না, ভাল ক'রে খায় না, রাত্রে ঘুমোয় না।

কাজেই মনের সঙ্গে তার স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়ল অল্প দিনের মধ্যেই।

রাজকন্যা অসুস্থ দেহ এবং ভাঙা মন নিয়ে একা গভীর রাত্রে জানালার ধারে চুপচাপ ব'সে থাকে।—তখন নববসন্তের হাওয়া তার মনকে আরও উদাস করে দেয়। হঠাৎ তার মনে হয় আরও কি যেন সে হারিয়েছে—কিন্তু কি তা সে বুঝতে পারে না।

(বৈজয়ন্তী, চৈত্র, ১৩৪৬)

বিশ্বনাট্য

বাগানের একটা বেঞ্চে ওরা দু'জন সন্ধ্যাবেলা এসে বসেছে। দু'জনেরই মন চঞ্চল, দু'জনেই আজ একটা সঙ্কট পার হ'তে চলেছে। পার হ'য়ে গেলেই দু'জনে দুই বিপরীত মুখে যাত্রা করবে।

জীবন এখনও আশা ক'রে আছে সুরমা রাজি হবে। সুরমা যথেষ্ট বল সঞ্চয় ক'রে এসেছে, সে সাহস ক'রে সত্য কথাটি বলবে। অর্থাৎ সুরমা বজ্র নিক্ষেপ করবে আর জীবন সেই বজ্র মাথা পেতে নেবে।

চতুষ্কোণ সমস্যা। জীবনকুমারের জন্যে তার মা একটি গ্রাম্য বালিকাকে ঠিক করে রেখেছেন, ছেলের এম-এ পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই মেয়েটিকে ঘরে আনবেন। এদিকে সুরমার পাত্রও ঠিক হয়ে আছে সুরমার বি-এ পরীক্ষা শেষ হ'লেই বিয়ে হয়ে যাবে। জীবন সম্বন্ধে সুরমা সবই জানে, জীবন সুরমা সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

জীবন মুখর, সুরমা নীরব। জীবনের অবশ্য খুব দোষ নেই। তারই বোন ঘটকালি করতে গিয়েছিল, সেও জানত না সুরমার বিয়ে ঠিক হ'য়ে আছে; সুরমা জীবনদের বাড়িতে, জীবনেরই বোন সুলতার নিমন্ত্রণে পূজোর ছুটি কাটাতে এসেছিল। তারপর সুলতার একদিন খেয়াল হ'ল বন্ধুটিকে বৌদি ক'রে ঘরে

রেখে দেবে। কিন্তু সে কথা জীবনের কানে যাওয়া অবধি তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সুরমাকে সে স্পষ্টই একদিন বলে ফেলেছে সে তাকে বিয়ে করতে চায়। সুরমা তার উত্তরে কোনো কথাই বলেনি, হেসে পালিয়ে গেছে মাত্র।

ছুটি ফুরিয়ে এসেছে, সুরমা এবার চলে যাবে কিন্তু যাবার আগে সে জীবনের স্বপ্নটি ভেঙে দিয়ে যাবে এই তার ইচ্ছা। এবং তারই ইচ্ছায় ওরা দু'জনে বাগানের বেঞ্চিটায় এসে বসেছে।

সুরমাই আগে কথা আরম্ভ করেছে। সে খুব সংযত ভাবেই নিজের কথাটি প্রকাশ করল, "আমাকে ক্ষমা করবেন আপনি।

জীবন স্তম্ভিত ভাবে কথাটি শুনল এবং বুঝতে পারল কিছু না জেনে নিজেকে এতখানি ছোট করা তার অন্যায় হয়ে গেছে।

জীবন বলল, "আমাকেই ক্ষমা ক'রো সুরমা, আমি না জেনে অন্যায় করেছি।"

সুরমার এইখানেই উঠে যাওয়া উচিত ছিল, কেননা দুজনেই দুজনকে বুঝতে পারল, ভুল বোঝার আর কিছু রইল না। কিন্তু নির্বোধ সুরমা এর পরেও কথা চালাতে লাগল। সে জীবনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "আমরা প্রতিদিন কত ভুল করছি এই ভাবে, কিন্তু সেজন্যে ভগবান আমাদের ক্ষমা ক'রে থাকেন।"

ভগবান কিন্তু এ কথায় বিব্রত হ'য়ে পড়লেন।

জীবন অসীম বিরক্তির সঙ্গে বলল, "ভগবানের নাম আর ক'রো না, দরকারের সময় তাঁকে পাওয়া যায় না কোনো দিন।"

সুরমা হেসে বলল, "সে কথা মিথ্যে নয়। আপনার নিজের মনেই একটা সান্ত্বনা মিলবে দু'দিন পরে।"

জীবন ব্যথিত সুরে বলল, "কিন্তু সুরমা, তোমাকে শুধু যে পেলাম না তাই নয়, মায়ের কথামতো আমাকে একটি পল্লীর মেয়েকে বিয়ে করতে হবে, তাকে কিছুদিন আগে নাকি তিনি দেখেও এসেছেন। তুমি হয়তো শুনে মনে মনে হাসছ, ভাবছ লোকটার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা হয়েছে, তাই না?"

সুরমা জোরের সঙ্গে বলল, "মোটেই না।"

জীবন। তুমি এ রকম বিবাহ সমর্থন কর?

সুরমা। ক্ষতি কি? আমি কয়েকখানা বই বেশি পড়েছি বলেই কি আমার দাম খুব বেড়ে গেছে?

জীবন। কয়েকখানা বই পড়ার কথা নয়। কথা হচ্ছে, যে ইতিহাস জানে না, ভূগোল জানে না, অঙ্ক জানে না, বিজ্ঞান জানে না, তার সঙ্গে আমার মিল হবে কি করে?

সুরমা। আপনি কি মনে করেন, আমরা এ সব, এই ইতিহাস ভূগোল সাহিত্য বিজ্ঞান, সত্যিই শিখেছি?

জীবন। এ প্রশ্নের উত্তর ভেবে দিতে হবে।

জীবন ভাবতে লাগল। অন্ধকার রাত্রি, আকাশে মাথার

উপর গোটাকতক নক্ষত্র দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। কারও মুখে কোনো কথা নেই। জীবন মনে মনে আলোচনার ধারাটা ঠিক ক'রে নিচ্ছিল—কিন্তু হঠাৎ একটা শব্দে বাধা পড়ল।



ফুলের বাগানের একটা ধারে একটা ছোট ঝোপ। মনে হ'ল তার মধ্যে কেউ লুকিয়ে আছে, শুকনো ডাল আর পাতা খচ্‌মচ্ করে উঠল।

জীবন এক লাফে উঠে পড়ল।

শব্দে সন্দেহ রইল না কোনো লোক সেখানে নিশ্চয়ই আছে। জীবনের রোমান্স এক মুহূর্তে ছুটে গেল, সে লাফিয়ে পড়ল সেই ঝোপের মধ্যে। তার পর ধ্বস্তাধ্বস্তি হুটোপুটি চলল কিছুক্ষণ। সুরমা ভয়ে কাঠের মতো হয়ে

বসে রইল। বেশ কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর জীবন তাকে ধরে নিয়ে এল সুরমার কাছে।

সুরমা সাহস পেয়ে ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করল, "লোকটা কে?"

জীবন বলল, "চোর হবে নিশ্চয়, আমরা থাকাতে সুবিধা হচ্ছিল না, অপেক্ষা করছিল কখন আমরা উঠব।"

লোকটা কিন্তু চুপ করেই রইল। জীবন তাকে বলল, "আর পালাবার চেষ্টা ক'রো না, এখন ভাল মানুষের মতো বল তো তুমি কে এবং কেন এখানে এসেছ।" কিন্তু লোকটা তথাপি কোনো কথাই বলল না।

জীবন পকেট থেকে দেশলাই জ্বেলে দেখল, লোকটি বৃদ্ধত্বের শেষ ধাপে পৌঁছেছে, পরনে চেহারার মতোই জীর্ণ পোষাক। চেহারা দেখে দু'জনেরই কেমন সব গোলমাল হ'য়ে গেল, তাকে চোর ব'লে কিছুতেই মনে হ'ল না। তবে কে এই বৃদ্ধ? বৃদ্ধ কিছুই না বলাতে জীবনের জেদ বেড়ে গেল, তার উপর জোর খাটাতে লাগল। তার হাত ধ'রে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বলিল, "বল তুমি কে, নইলে তুমি মারা যাবে আমার হাতে!"

বৃদ্ধ এতক্ষণে কথা বলিল। "ধ'রে ফেলেছ যখন, তখন বলছি। 'আমি ভগবান।"

জীবন এবং সুরমা দু'জনেই হেসে উঠল তার কথা শুনে। জীবন বলল, "ও! বোধ হয় আমাদের মুক্তি দিতে এসেছ।"

বৃদ্ধ বলিল, 'না, আমি কাউকে মুক্তি দিতে পারি না।

আমিই মুক্তির জন্যে ঘুরে বেড়াই। তোমাদের হাত থেকে কবে মুক্তি পাব জানি না।"

জীবন বিরক্ত হ'য়ে বলল, "তোমার ঐ নাটকীয় ভঙ্গীর কথা আমি শুনতে চাই না, তোমার সত্য পরিচয় দাও।"

বৃদ্ধ বলিল, "আমার কথায় যদি নাটকীয় ভঙ্গী ফুটে থাকে তা হ'লে আমার অপরাধ নিও না, কারণ আমি এই বিশ্ব-নাট্যের প্রডিউসার। রচযিতাও বলতে পার।"

জীবন বলল, "তুমি যেই হও, তোমাকে সহজে ছাড়ছি না।"

সুরমা হেসে বলিল, "আপনি যে ভগবান সে বিষয়ে আমাদের কিছু সন্দেহ আছে—দূর করতে পারেন সে সন্দেহ?"

বৃদ্ধ বলিল, "চেষ্টা করতে পারি, কিন্তু দূর হবে কি জানি না।"

জীবন বিদ্রূপের সুরে বলল, "আচ্ছা প্রভু, চেষ্টা কর।"

বৃদ্ধ বলল, "কি করলে খুশী হবে? কিছু ম্যাজিক দেখাব?"

জীবন। আগে তোমাকে দেখাও, অন্ধকারে তোমাকে ভাল দেখতে পাচ্ছি না।

বৃদ্ধ। এই দেখ।

জীবন এবং সুরমা অবাক হ'য়ে দেখল, বৃদ্ধের সর্বাঙ্গ ফস্‌ফরাসের আলোর মত আলোকিত হয়ে উঠেছে, দাড়ি গোঁফ চুল সমস্ত একটা স্নিগ্ধ আলো বিকিরণ করছে, এমন আলো যে তা'তে বই পড়া যায়। দু'জনেই অবাক হ'য়ে গেল।

কিন্তু জীবন ওতে ভুলল না, সে বলল “দেখলাম তোমার ম্যাজিক, কিন্তু তাতে কিছু প্রমাণ হ'ল না।”

বৃদ্ধ বলল, “ম্যাজিক না দেখলে তোমারা কারও ক্ষমতা স্বীকার কর না, তাই দেখলাম। আচ্ছা এইবার দেখ।”



দেখা আর হ'ল না, জীবন এবং সুরমা হঠাৎ পায়ের নীচে ভূমিকম্পের প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব ক'রে দু'জনেই বেঞ্চি থেকে মাটিতে পড়ে গেল। জীবন আপন মনে ব'লে উঠল “এ কি ব্যাপার।” সুরমা চেঁচিয়ে উঠল, “মা গো।”

বৃদ্ধ প্রশ্ন করল, “আরও দেখতে চাও?”

জীবন কাতর স্বরে বলল, “দাঁড়াও এই ধাক্কাটা আগে সামলে নিই।”

সে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে সুরমাকে টেনে তুলল এবং বেঞ্চিতে বসিয়ে দিল। জীবন বৃদ্ধকে একেবারে ‘কিছু না’ বলে উড়িয়ে দিতে পারল না, বলল, “এটা অবশ্য ম্যাজিক ব'লে মনে হচ্ছে না, কিন্তু তোমাকে এ ভাবে আর কিছু দেখাতে হবে না। বুঝতে পেরেছি তোমার ক্ষমতা

আছে, সেই ক্ষমতার পরিচয় এবারে অন্যভাবে পেতে চাই।

বৃদ্ধ জীবনের দিকে মুখ তুলে বলল, "কি ভাবে ?"

জীবন ফস্ ক'রে বৃদ্ধের কানের কাছে মুখ নিয়ে চাপা গলায় বলল, "আমার সঙ্গিনীকে আমি বিয়ে করতে চাই, তুমি এখুনি ওর মনটা ফিরিয়ে দিতে পার আমার দিকে ?"

বৃদ্ধ গম্ভীর কণ্ঠে বলল, "না, আমি কারও মনের উপর হস্তক্ষেপ করি না।"

জীবন। কারও উপরে তোমার দয়া মায়া নেই ? কাউকে তুমি কৃপা কর না ? অথচ তুমি ভগবান ?

বৃদ্ধ। আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। আমি বিশুদ্ধ নাট্যকার, আমার সৃষ্ট চরিত্র নিজের জোরে চলে, নিজের মনের কথা বলে, আমার নিজস্ব কোনো অংশই তারা অভিনয় করে না। তাদের দৃষ্টি আর আমার দৃষ্টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

জীবন। তোমার এই কথাগুলো শুনে আমার মনে একটা নতুন সন্দেহ জাগছে।

বৃদ্ধ। কি, বল।

জীবন। তুমি কোনো কলেজের ইংরেজির প্রফেসর, বর্তমানে উন্মাদ হয়েছে।

বৃদ্ধ। কিন্তু ভূমিকম্পটা ? কোনো ইংরেজির প্রফেসর কি ওটাও দেখাতে পারে ?

জীবন। না, তা পারে না বটে, আর সেই জন্যেই তোমার

সম্বন্ধে জোর করে কিছু বলতে পারছি না। তবে তুমি নাট্যকার হ'লেও তৃতীয় শ্রেণীর। ভূমিকম্প, প্লাবন, এই সব না থাকলে তোমার নাটক অচল হয়, না ?

বৃদ্ধ। অচল হয় তোমাদেরই কাছে। কিন্তু তাড়াতাড়ি বলে ফেল, আর কিছু দেখতে চাও কিনা। আমি কে এখনও কি সন্দেহ আছে ?

জীবন। তুমি যে অসাধারণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু তুমি ভগবান কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

বৃদ্ধ। তোমার সন্দেহের কারণ আমি বুঝতে পেরেছি। বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে আমি তোমাদের কাছ থেকে বড় দূরে সরে গিয়েছি, কিন্তু তোমাদের পূর্বপুরুষেরা জানেন আমি ছিলাম তাঁদের হাতের কাছে।

জীবন। তা হবে। কিন্তু তুমি চোরের মতো লুকিয়ে ছিলে কেন ? পালাবার চেষ্টা করলে কেন ? তোমার এত ক্ষমতা তবু ধরা পড়লে কেন ?

বৃদ্ধ। এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে অনেক অরুচিকর কথা বলতে হবে। সে আর শুনে দরকার নেই। তবে আপাতত তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ।

জীবন। একবার বলছ তুমি বিশ্বজগতের নাট্যকার, সব তোমার সৃষ্টি, আর একবার বলছ আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি—এই পরস্পর বিরোধী কথা আমি বিশ্বাস করি কেমন ক'রে ?

বৃদ্ধ। তুমি বিশ্বজগতের পিতামহের পদটি গ্রহণ করলেই আমার কথার কোনো অসঙ্গতি থাকে না। বিশ্বজগতের স্রষ্টা আমি, আমার স্রষ্টা তুমি, তা হলে তুমি বিশ্বজগতের সম্পর্কে হ'লে ঠাকুরদা। শুনে হাসি পাচ্ছে? তা হ'লে আসল কথাটি শোন। আমি যখন বলি বিশ্বজগৎ আমার সৃষ্টি, অথচ বিশ্বজগতের উপর আমার কোনো হাত নেই, তখন তার একটি মাত্র অর্থই হ'তে পারে। তুমি যদি বল ভারতবর্ষটা তোমার জমিদারি, কিন্তু এর উপর তোমার কোনো কর্ত্তৃত্ব নেই, তা হ'লেও তার ঐ একটি মাত্র অর্থই হয়। সে হচ্ছে, আমি যখন ঐ কথা বলি তখন আমি উন্মাদ, তুমি যখন ঐ কথা বল তখন তুমি উন্মাদ।

জীবন। তা হ'লে তুমি কারও কাজে লাগ না?

বৃদ্ধ। আদৌ না।

জীবন। পৃথিবীর সবাই তোমার কাছে কত প্রার্থনা জানায় সে সব তোমার কানে যায় না?

বৃদ্ধ। আদৌ না।

জীবন। তোমার কথা সত্য হ'লে ভাববার কথা, কিন্তু কাজ কর আর না কর, তুমি যদি ভগবান তা হ'লে আমার বহু দিনের কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও। বল তো এই বিশ্ব অসীম না সসীম?

বৃদ্ধ। আমি ঠিক জানি না।

জীবন। মৃত্যুর পর আত্মা ব'লে কিছু আছে?

বৃদ্ধ। আছে কি না বুঝতে পারি না।

জীবন। তুমি ভগবান হ'য়ে প্রতারণা করছ আমাকে ?

বৃদ্ধ। মোটেই না।

জীবন। মিছে কথা ব'ল না, সোজা আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী আর অন্যান্য গ্রহ ঘুরছে কেন ?

বৃদ্ধ। তাদের খুশী।

জীবন। দেখ রসিকতা করার সময় আমার নেই। আমি সত্যিই জানতে চাই এ সব।

বৃদ্ধ। রসিকতা করছি না আমি।

জীবন। আচ্ছা পৃথিবীতে এত অশান্তি কেন ?

বৃদ্ধ। অশান্তি আছে না কি পৃথিবীতে ?

জীবন ক্রমে ক্ষেপে যেতে লাগল বুড়োর উপর। সে তার হাতখানা সজোরে ধ'রে বলল, "তোমার অদৃষ্টে বিশেষ অশান্তি আছে আগেই বলে রাখছি।"

বৃদ্ধ করুণভাবে বলল, "আমি কি বলব বল ? আমি কোনো কিছুরই অর্থ বুঝি না, শুধু দেখি মাত্র। তাও আবার সে দেখা তোমাদের দেখার চেয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।"

জীবন হতাশ হ'য়ে বৃদ্ধের হাত ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তা হ'লে তুমি ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, বটানি ইত্যাদি কিছুই জান না ?

বৃদ্ধ। অনেকবার বুঝতে চেষ্টা করেছি এ এসব, কিন্তু মাথায় কিছুই ঢোকে না।

জীবন। তবে এই বিশ্বনিয়ম-শৃঙ্খলার গুরু কে, স্রষ্টা কে ?

বৃদ্ধ। কোটি কোটি বছর ধ'রে ঐ একই কথা ভাবছি, কিন্তু কোনো কিনারা হয় না।

জীবন। মনে হয় না কি যে এর পিছনে কোনো ওস্তাদ শিল্পী আছেন ?

বৃদ্ধ। অনেক সময় মনে হয় বটে।

সুরমা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, "আচ্ছা পিতঃ, আপনি এ-প্লাস-বি হোল-স্কয়ারের ফর্মুলাটা জানেন ?"—প্রশ্নের উদ্দেশ্য, বৃদ্ধ নিম্নস্তরের কিছু জানে কি না পরীক্ষা করা।

বৃদ্ধ বলল, "তাও জানিনা। দুই আর দুই চার হয় মাত্র তাই জানি, কিন্তু কেন হয় জিজ্ঞাসা ক'রো না, মা।"

সুরমা ভগবানের অজ্ঞতায় একেবারে হতাশ হ'য়ে পড়ল! উচ্চস্তরের কিছুই না জেনে এত কঠিন এত জটিল বিশ্ববিধান তাঁর হাতে কি ক'রে রচনা হওয়া সম্ভব তার কোনো মীমাংসাই হ'ল না। তার কাছে সবটাই খুব মজার মনে হচ্ছিল। মাঝে মাঝে তার খুব হাসি পাচ্ছিল। অনেক জেরা করেও যেটুকু জানা গেল তা'তে এইটুকু মাত্র বোঝা যায় যে, ভগবানের জ্ঞান ম্যাট্রিকুলেশন স্ট্যাণ্ডার্ডের বেশি নয়।

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "এইবার আসি মা।"

সুরমা তাড়াতাড়ি বৃদ্ধের পায়ের ধুলো নিতে গেল, বৃদ্ধ বাধা দিয়ে বলল, "থাক, থাক, ওটা আর দরকার নেই।" সে

কি করবে ভেবে না পেয়ে অগত্যা নমস্কার করল, বৃদ্ধ কিছুই বলল না।

জীবন আরও একবার উত্তেজিত হ'য়ে বলল, "সুরমা, যাদুকরের অতখানি সম্মান পাওনা নয়। বৃদ্ধ, তুমি যাই বল, আমি তোমাকে পুলিসে দেব, তুমি প্রতারক ছাড়া কিছু নও।" জীবন এগিয়ে গেল বৃদ্ধকে ধরতে। সুরমা জীবনের হাত টেনে ধ'রে রাখল, বলল, "না না আপনি হয় তো ভুল করছেন, ওঁকে ছেড়ে দিন, উনি আপনা থেকেই চলে যাচ্ছেন।"

জীবন বলল, "আচ্ছা, পুলিসে দেব না, ওকে বলতে হবে এখানে কেন এসেছিল।"

বৃদ্ধ বলল, "কেন এসেছি তা একবার বলেছি। কিন্তু আমি বাংলাদেশে কেন এসেছি তা বলিনি। এসেছিলাম তোমাদের এক শহরে। সেখান থেকে ফিরে যাবার পথে তোমার ডাক শুনে এখানে এসে বসেছি। যে-আমি শহরে গিয়াছিলাম, তা থেকে এ-আমি স্বতন্ত্র।"

জীবন। শহরে কেন এসেছিলে?

বৃদ্ধ। সিনেমা আর থিয়েটার দেখলাম সেখানে কিছুকাল ধ'রে।

জীবন। কেন?

বৃদ্ধ। আমি নিজে নাট্যকার আগেই বলেছি।

জীবন। কিছু শিখতে এসেছিলে?

বৃদ্ধ। বিপদে পড়ে এসেছিলাম।

জীবন। কি রকম?

বৃদ্ধ। আমার নাটকের সব চরিত্র আপনা থেকেই চলে তাদের নিজেদের বুদ্ধিতে অথবা প্রবৃত্তিতে। কিন্তু থেকে থেকে অচল হ'য়ে পড়ে, প্লট বাধা পায়। ধর তোমাদের কথা। আমি স্পষ্ট দেখছি, তোমরা দু'জনে মিলতে পারবে না কোনো দিন, অথচ তুমি সুরমার সঙ্গে মিলতে চাও।

জীবন। এ রকম অবস্থা কি তোমার কাছে নতুন?

বৃদ্ধ। নতুন নয়। এ রকম অবস্থায় আগে এরা প্রায় আত্মহত্যা করত। এইটেই ছিল আমার জানা, কিন্তু কিছুদিন হ'তে তাদের আর মরতে দেখছি না অথচ ব্যর্থতা মানুষের জীবনে আগের মতোই আছে। তাই মনে হ'ল নিশ্চয় এ রকম অবস্থার জন্যে তোমাদের মধ্যে কোনো নতুন ব্যবস্থা হয়েছে। তোমাদের এক শহরে এসে মাসখানেক থেকেই বুঝেছি আমার অনুমান ঠিক। নতুন ব্যবস্থা হয়েছে।

জীবন। ব্যর্থতা বা সফলতা বোঝ অথচ আগে তুমি বলেছ অশান্তি আছে কি না জান না।

বৃদ্ধ। কিন্তু এ কথাও বলেছি যে, সব কিছুই তোমরা যে চোখে দেখ আমি সে চোখে দেখি না। শান্তি বা অশান্তি আমার কাছে পৃথক নয়, সম্পূর্ণ এক—ওর মধ্যে কোন্‌টা ভাল বা কোন্‌টা মন্দ সে প্রশ্নও আমার মনে জাগে না। তা' ছাড়া

ভাল বা মন্দ কথারও আমার কাছে কোনো অর্থ নেই, কথা বলতে তোমাদের ভাষা ব্যবহার করেছি মাত্র। নইলে বুঝতে পারতে না।

জীবন। বুঝেছি। তুমি আগে যা বলছিলে তাই বল। মিলনের ব্যর্থতায় নতুন কি ব্যবস্থা হয়েছে বল।

বৃদ্ধ। ব্যবস্থাটা সহজ। যারা পরস্পর মিলতে পারল না, তারা মাঝে মাঝে পরস্পরের ফোটোগ্রাফ সামনে নিয়ে যদি স্বগত বক্তৃতা দেয়, চোখের জল ফেলে, তা হলেই তাদের মন তখনকার মতো বেশ হাল্কা হয়ে যায়।

জীবন। নিজে দেখেছ এটা?

বৃদ্ধ। না দেখে কি আর বলছি? আমার নাটকের চরিত্রগুলো তাদের রীতি বদলালো কেন তাই দেখতে এসেছিলাম। দেখলাম তারা এটা নিয়েছে মানুষের নাটকের চরিত্র থেকে, অর্থাৎ তোমাদেরই থিয়েটার আর সিনেমা থেকে। ভালই করেছে, অকারণ আত্মহত্যার দুঃখ থেকে বেঁচে গেছে।

সুরমা বৃদ্ধকে বিনীতভাবে বলল, "তা হবে। কিন্তু নিতান্তই যদি যাবেন তা হ'লে যাবার সময় আর একবার আপনার কিছু লীলা দেখিয়ে যান।"

বৃদ্ধ বলল, "তথাস্তু।"

জীবন এবং সুরমা হঠাৎ তাদের সম্মুখে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখতে লাগল। বৃদ্ধ নিজে শহরের সিনেমা থিয়েটারে যে সব

দৃশ্য দেখে নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে—সেই সব দৃশ্য হঠাৎ তাদের চোখের সম্মুখে ফুটিয়ে তুলল। দেখতে দেখতে জীবন আর সুরমা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ল। যখন তাদের মোহ ভাঙল তখন দেখে তারা দু'জনেই মাটিতে কাৎ হ'য়ে পড়ে আছে। আস্তে আস্তে তাদের চেতনা ফিরে এল। সুরমার বিস্ময় তখনও কাটেনি। সে বলল, "সব স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।"

জীবন সব স্মরণ ক'রে বলল, "আগাগোড়াই প্রতারণা, লোকটা পোর্টেবল্ মেশীন থেকে সিনেমা দেখিয়ে গেল!"

সুরমা বলল, "কিন্তু আমার বিশ্বাস যিনি এসেছিলেন তিনিই ভগবান।"

জীবন বিরক্ত হয়ে বলল, "ভগবান যদি তবে কিছু জানে না কেন?"

সুরমা বলল, "কিছু জানেন না ব'লে মহাসুখে আছেন। জ্ঞানই দুঃখ, এ বিষয়ে বাইবেলের গল্পের সঙ্গে আমি একমত।"

জীবন একটু ভেবে নিয়ে বলল, "তা হ'লে"—

সুরমা কথাটা জীবনের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বলল, "তা হ'লে আপনার মায়ের আদেশমতো পল্লীবালাকেই করুন আপনার জীবন-সঙ্গিনী।"

জীবন এতক্ষণ প্রেম বিবাহ ইত্যাদি সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিল, সুরমার কথায় আবার তার সব মনে পড়ে গেল। সে আবার বিচলিত হ'য়ে উঠল।

সুরমা সান্ত্বনার সুরে তাকে আবার বলল, "দেখলেন তো

উনি কিছুই জানেন না, অথচ যাবতীয় দৃশ্য অদৃশ্য জগৎ সব কিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন।”

কিন্তু জীবন তাতে সান্ত্বনা পেল না, সে বলল, “সুরমা, বুঝি তো সব, কিন্তু আমাকে সত্যি করে বল তো তুমি নিজে শিক্ষিত ব'লে কি দুঃখিত ?”

সুরমা বলল, “তা তো বলিনি। আমি চেষ্টা করছি আমার মোহ থেকে আপনাকে মুক্ত করতে। ভগবান আমার সহায়।”

জীবন এ কথায় বিচলিত হ'য়ে ব'লে উঠল, “বুঝেছি। বুঝেছি সবাই প্রতারক, ভগবান প্রতারক, তুমি প্রতারক, নইলে এতদিন এই অভিনয় করার কি দরকার ছিল ?”

জীবন মুহূর্তে নিজেকে ভুলে গিয়েছিল, তাই এমন রূঢ় কথাও তার মুখ থেকে উচ্চারিত হ'ল।

সুরমা কিন্তু এ কথায় লেশমাত্র বিচলিত হ'ল না। সে তার হাতব্যাগের ভিতর থেকে নিজের একখানা ফোটোগ্রাফ বার ক'রে নীরবে জীবনের হাতের মধ্যে গুঁজে দিল। ব্যাগটি বেঞ্চির উপরেই ছিল।

জীবন ফোটোগ্রাফ নিয়ে ধীরে ধীরে উঠে গেল। সুরমা বেঞ্চিতে উঠে বসল। ব'সে আকাশের দিকে চাইল। ঐ আকাশে সে ইতিপূর্বে অপরূপ দৃশ্য দর্শন করেছে।

মিনিট পাঁচেক পরে জীবন ফিরে এল। গতি তার মন্থর, মনে তার যুগান্তরের বেদনা। জীবন ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে

সুরমার পাশে বসল। তারপর হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশের মধুরতম অনুরাগরসসিক্ত স্বরে ডাকল—"সুরমা!"

সুরমা বলল, "কি!"

জীবন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, "তোমার হাতখানা দাও।"

সুরমা হাত এগিয়ে দিল।

এত সহজে পাওয়া হাতখানা জীবন ধরবে কি না একটু চিন্তা করল, কিন্তু সে নিজেকে সংযতই করল। হাত না ধ'রে সেই হাতে সে তার নিজের একখানা ফোটোগ্রাফ রাখল, সুরমা সেখানা তখনই ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল।

অনেকক্ষণ কারও মুখেই কোনো কথা নেই। মিনিট দশেক এইভাবে কাটার পর জীবন বলল, "অনেক রাত হ'য়েছে ওঠ।"

শ্রীপরিমল গোস্বামীর লেখা

ট্রামের সেই লোকটি

ব্ল্যাক মার্কেট

তুষ্মন্তের বিচার

ঘুঘু, বুদ্বুদ

ক্যামেরার ছবি

আষাঢ়ে দেশে

ডিটেকটিভ শিবনাথ

শ্রীপরিমল গোস্বামী সম্পাদিত

মহামন্বন্তর

